খুনী দরওয়াজা

বিক্রমাদিত্য

বেঙ্গল পাবলিশার্স
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৬২

প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট

কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর—

শ্রীনরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

স্বপ্না প্রেস লিমিটেড্

৮।১, লালবাজার স্ট্রীট

কলিকাতা—১

প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনায়

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

কলিকাতা—১২

দেড় টাকা

মনোজ বসু

শ্রদ্ধাস্পদেষু

লেখকের অন্যান্য বই :

দেশে দেশে

ফতেনগরের লড়াই

কৈফিয়ত

গল্প বলে ইতিহাস রচনা করার প্রথম প্রেরণা দিলেন শ্রীমনোজ বসু ও শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। মনে মনে ভয় ছিল যে একাজ করতে পারবো কিনা কিন্তু 'মৌচাকের' শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় এ সংশয় ভেঙ্গে দিলেন। তাঁর কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে ছোটদের জন্যে 'খুনী দরওয়াজা' নাম দিয়ে মৌচাকে একটা গল্প লিখলাম। এ কাহিনী তারই বিস্তৃত বিবরণ।

সিপাহী বিপ্লব নিয়ে কোন কাহিনী লেখা, বিপ্লব শুরু করার মতোই দুরূহ কাজ। অতএব এ কাহিনীকে সিপাহী আন্দোলনের ইতিহাস না ধরে, গল্প হিসাবেই বিচার করলে খুশী হবো। কারণ ১৮৫৭'র আন্দোলনের কাহিনী লিখতে গেলে এ সামান্য কয়েক পাতায় কুলোবে না।

যদিও এ কাহিনী গল্প, তবু ইতিহাস থেকে বিচ্যুত হইনি। যদি দু-এক জায়গায় হয়ে থাকে তবে সংলাপের খাতিরে। আশা করি যাঁরা এ বই পড়বেন তাঁরা এই অপরাধের জন্য মার্জনা করবেন।

বহুজনা, বহু পরামর্শ দিয়ে আমায় সাহায্য করেছেন। বিশেষ করে আমার পিতৃদেব। তিনি জীবন ভরে ছাত্রদের বই পড়বার যে পরামর্শ দিয়েছেন সেই উপদেশই তিনি আজ আমায় দিয়েছেন। পাণ্ডুলিপি পড়ে সাহায্য করেছেন শ্রীযুক্তা অনীতা সেন ও বন্ধুবর সন্তোষ বাগচী। অনেকগুলো বই পাইয়ে

দিয়েছেন—সরকার মহাশয়। আরো বহুজনে বই দিয়ে সাহায্য করেছেন কিন্তু নাম প্রকাশে তাঁরা অনিচ্ছুক। এদের সবার কাছে আমি চিরঋনী।

যে সব বই'র সাহায্য পেয়েছি ঃ—

কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি (পঞ্চম খণ্ড), টোয়াইলাইট অব দি মুঘলস (প্যাসিভাল স্পিয়ার), দি হিরো অব দেল্লী (হ্যাসকেথ পিয়ার্সন), ফর্টিওয়ান ইয়ারস ইন ইণ্ডিয়া (লর্ড রবার্টস), হিস্ট্রি অব দি ইণ্ডিয়ান মিউটিনি (কে. ও. ম্যালেসন), হিস্ট্রি অব দি ইণ্ডিয়ান মিউটিনি (টি. আর. ই. হোম্‌স), টু নেটিভ ন্যারেটিভ্‌স অব দি মিউটিনি ইন দেল্লী (মুনসী জীবনলাল ও মৈনুদ্দিন খাঁ—সম্পাদনা সি. টি. মেটকাফ), দেল্লী পাস্ট এণ্ড প্রেজেণ্ট (ফনশ'), বাহাদুর শা'র জীবনী (১৮৭০), মৌলভী জাকাউল্লা অব দেল্লী (সি. এফ. এণ্ড্রুজ), সিলেকসন্‌স ফ্রম দি স্টেট পেপারস ইন দি মিলিটারী ডিপার্টমেণ্ট, স্বাধীনতার প্রথম সংগ্রাম (সাভারকর), পাঞ্জাব রের্কডস মিউটিনি পেপারস, র‍্যাম্বেলস এ্যাণ্ড রিকালেকসন (ডব্লিউ. এচ. শ্লীম্যান), লাইফ অব লর্ড লরেন্স (বসওয়ার্থ স্মিথ), দি মেন হু রুলড ইণ্ডিয়া—দি ফাউণ্ডার্স (ফিলিপ উডরূপ), দেল্লী গেজেটিয়ার (১৮৮৩-৪), সণ্ডার্স পেপারস, জন লরেন্স টু সণ্ডার্স, দি পলিটিক্যাল থিয়োরী অব দি ইণ্ডিয়ান মিউটিনি (এফ. ডব্লিউ. বাটলার), মাই ডায়েরী ইন ইণ্ডিয়া (ডব্লিউ. এচ. রাসেল) দি আদার সাইড অব দি মেডেল (এডওয়ার্ড টম্পসন), সিপাহী যুদ্ধ (কে), দি ক্রাইসিস ইন দি পাঞ্জাব (কুপার), এড-মিনিস্ট্রেশন অব দি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী—এ হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়ান

প্রোগ্রেস (কে), দেল্লী রেসিডেন্সী এ্যাণ্ড এজেন্সী, বেন্টিক পেপারস, এ হিস্ট্রি রে'ন অব শা আলম (ডব্লিউ. ফ্রাঙ্কলিন), ওয়ারেন হেস্টিংস (ডেভিস), বিশপ, হেবারস ন্যারেটিভ, হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া এ্যাজ টোল্ড বাই ইটস হিস্টোরিয়ানস (এলিয়ট ও ডাউসন), ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার (কানপুর-লক্ষ্ণৌ), সিলেক্টেড দেল্লী রিপোর্টস, ট্রাভেলস ইন ইণ্ডিয়া (এল. অরলিক্), ট্রায়ালস অব বাহাদুর শা, ইয়রোপীয়ান এডভাঞ্চরার্স ইন দি পাঞ্জাব (সি. গ্রে ও গ্যারেট), লেটার মুঘলস (অরভিং—সম্পাদনা ডাঃ যদুনাথ সরকার), প্রেস লিস্ট অব মিউটিনি পেপারস (সম্পাদনা জে. এম. মিত্র—কলিকাতা, ১৯২১), ইণ্ডিয়া এ হাণ্ড্রেড ইয়ারস এগো (টি. টুয়ানিং), এ্যান আনরেকর্ডেড চ্যাপ্টার অব দি মিউটিনি (জি. উইলবারফোর্স), ফল অব দি মুঘল এম্পায়ার (ডাঃ যদুনাথ সরকার—৪ খণ্ড), গেজেটিয়ার অব ইণ্ডিয়া (ই. থর্ণটন—৩ খণ্ড), ফল অব দি মুঘল এম্পায়ার (এইচ. জী. কীন)।

এ ছাড়া বহু মূল্যবান তথ্যাদি দিল্লী স্টেটে রক্ষিত আছে।

এক

গোধূলির অস্তরাগে পশ্চিম আকাশ রাঙা হয়ে উঠেছে।

রূপ বদলেছে পৃথিবীর। ঘন আঁধার আসছে নেমে। একটু বাদেই ঐ লাল আলো মিলিয়ে যাবে।

নির্জন, নিস্তব্ধ চারিদিক।

দিগন্তপ্রসারী মাঠ। তার পাশ দিয়ে চলে গেছে সরু রাস্তা।

কে যায়?

ঐ পথ দিয়ে এগিয়ে চলে কার ছায়া। ঐ পাল্কী, টগবগিয়ে যায় ঘোড়া, ও কার!

দূর······দূর······দূর······

উঠছে ধূলা, ছুটছে ঘোড়া, পাল্কী চলে হুব্রাহুম, হুব্রাহুম।

এ যাত্রা কার?

ঐ যে ঘোড়সওয়ার, ঐ তো হলো ওমানি। কোম্পানীর বরকন্দাজ। সাতসমুদ্দুর তেরো নদীর পারে ওর ঘর। আর ঐ পাল্কী·········

পাল্কী থামে, মিছিলের গতি যায় রুখে। পাল্কীর দরজা খুলে যাত্রী একবার নয়ন ভরে দেখে নেন ঐ ছেড়ে আসা নগরীকে।

কতোদিনের প্রাচীন শহর—কতো ধ্বংসস্তূপে বোঝাই। এই নগরীর স্তরে স্তরে আছে কতো লোকের স্মৃতি।

এই সেই নগরী। একদিন যাত্রীর পূর্বপুরুষের হুংকারে এই নগরী উঠেছিল কেঁপে। তাদেরই কাছে শহরবাসীরা

করেছিল মাথা নত। সেদিন তারা করেছিলেন শত্রুর দমন—প্রজার শাসন।

আর আজ !

যুগের হয়েছে বদল। রাজার ভেরী হয়েছে নিস্তব্ধ। প্রজার কলরবে শহর হয় না মুখরিত।

রাজা করে না প্রজার বিচার—প্রজা শোনে না রাজার আদেশ !

এ যে নতুন যুগ, এ যে নতুন পৃথিবী।

ঘোড়সওয়ার আবার এগিয়ে চলে। তারই সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যায় পাল্কী। এগিয়ে চলে ছায়া। চিরদিনের জন্যে বিদায় নেন মুঘলবংশের দুলাল—দিল্লীর শেষ সম্রাট বাহাদুর শা, এদেশ থেকে।

সূর্য্য অস্ত গেলো। অন্ধকার······অন্ধকার······অন্ধকার··· এই সোনার দেশে নেমে এলো অন্ধকার।

দুই

আজি হতে শতবর্ষ আগে এই দিল্লী মহানগরীতে—

'চাঁদনী চক' লোকে লোকারণ্য। হৈ হুল্লোর—সোরগোল।

কী হয়েছে গো!

জানো না বুঝি, মিছিল বেরিয়েছে।

সাজানো হাতী, সাজানো ঘোড়া। বাজছে সানাই, দোকানী পসারীরা দোকান ছেড়ে এসে মিছিল দেখছে। ছেলের দল দাঁড়িয়ে দেখছে মজা। মিছিলের লোকগুলোর জমকালো পোশাক। গায়ে মেখেছে আতর, চোখে তাদের সুর্মা, পায়ে নাগড়া।

মিছিলের আগে একটা লোক মজা দেখায়। খালি ডিগবাজী খায়। তার কসরৎ দেখে জনতা হুল্লোর করে ওঠে।

কেয়াবাৎ……কেয়াবাৎ……কেয়াবাৎ……

খেলাটা আবার দেখাও মিঞা সাহেব—

জনতার অনুরোধ আসে চারদিক থেকে। মিঞা সাহেব আবার ডিগবাজী খায়। আবার জনতার চিৎকার ওঠে।

বলি মিন্সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছো কী? জিনিস বিক্রি করবে না?

বুড়ীর ডাকে দোকানীর তন্দ্রা ভাঙ্গে। সত্যিই একমনে সে মিছিল দেখছিল। জিনিস বিক্রি করার কথা তার একেবারেই খেয়াল হয়নি। তাই সে একটু লজ্জা পায়।

বলি কী দরে বিক্রি করছো গম ?—বুড়ী আবার প্রশ্ন করে।

এক টাকায় এক মণ গম পাবে মায়ী। আর এক টাকায় চার সের ঘি—দোকানী জবাব দেয়।

দাও দিকিনি পাঁচসের গম, আধসের ঘি—বুড়ী বলে।

এমনিভাবে শহরের বুক দিয়ে রোজই যায় মিছিল, চলে কেনা-বেচা, হাট বাজার। শহরবাসীদের মনে দুঃখ নেই, আছে ঐশ্বর্য। তাই তারা মিছিল দেখে আনন্দ পায়—কবিতা আউড়ে সময় কাটায়।

দোকানী বেচে তার জিনিস—শিল্পী আঁকে ছবি, আর যমুনার পাড়ে বসে কবি রচনা করেন কবিতা।

এমনি ছিল সোনার শহর দিল্লী।

* * *

এই সোনার পুরীর বাদশাহ তখন এক কবি। নাম তার বাহাদুর শাহ।

সিংহাসনে সম্রাট আছেন সত্য কিন্তু তার সাম্রাজ্য নেই। রাজদরবারে নেই প্রজার ভিড়, রাজপুরীতে আছে হাহাকার।

রাজকোষ শূন্য। অমন সাধের লাল কেল্লা, তার শ্রী হয়েছে লুপ্ত। মুঘল সাম্রাজ্যের গৌরব তখন অস্তাচলে। ময়ুর সিংহাসন চলে গেছে দূরে—বহু দূরে……সাগরপারে পারশ্য দেশে।

কিন্তু এই নিস্তব্ধতা ভেদ করে তবু মাঝে মাঝে আসে রাজ হুংকার।

সম্রাট আকবর শাহের পুত্র মির্জা জাহাঙ্গীর, বাহাদুর শাহের ভাই। তারই হুমকিতে প্রজা শংকিত হয়, আর কোম্পানীর সাহেবেরা তটস্থ হয়ে ওঠেন।

একদিন তার বিরুদ্ধে নালিশ নিয়ে কোম্পানীর এক সাহেব এলেন সম্রাট আকবর শাহের কাছে। শাহাজাদার বাদশাহী চাল কোম্পানীর সাহেবদের পছন্দ নয়। তাই কোম্পানীর রেসি-ডেণ্ট সাহেব বলে পাঠিয়েছেন······

সামনেই দাঁড়িয়েছিলেন মির্জা জাহাঙ্গীর। ব্যস্, আর কথা নেই। কোম্পানীর সাহেবের কথা শেষ হবার আগেই গর্জে উঠলেন তিনি। এ্যাদ্দুর স্পর্ধা তোমাদের! মুঘল সম্রাটের গোলাম হয়ে তারই ছেলের নামে নালিশ জানাতে এসেছো। বেরোও এখান থেকে।

সাহেবকে ঘাড়ে ধরে মির্জা জাহাঙ্গীর কেল্লা থেকে বের করে দিলেন।

খবরটা গেলো কোম্পানীর রেসিডেণ্ট সাহেবের কানে। তিনি ছাড়বার পাত্তর নন। ইংরেজ সবেমাত্র এ দেশে তাদের ভিত্তি গাড়তে শুরু করেছে। এ সময়ে বাদশাহী চাল সহ্য করলে তাদের অকূলে ভাসতে হবে। একটা বিহিত করা চাই। অতএব সীটন বলে এক সাহেব এলেন রাজদরবারে। আর্জি নিয়ে নয়, হুকুম নিয়ে।

ব্যাপারের গুরত্ব প্রথমে সীটনও বুঝতে পারেননি। কিন্তু কেল্লায় এসেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন যে মির্জা জাহাঙ্গীর আউরঙ্গজেবেরই বংশধর। হুংকার দেবার অধিকার

তার আছে। তাই সীটন বেশ কিছু পাইক বরকন্দাজ নিয়ে এলেন।

মির্জা জাহাঙ্গীরকে গ্রেপ্তার করতে এসেছি—সীটন সম্রাটকে কোম্পানীর আদেশ জানালেন।

কী বিপদ! ব্যস্ত হয়েই সম্রাট জবাব দেন। মির্জা জাহাঙ্গীর তার আদরের ছেলে। তিনি মনে মনে ঠিক করে রেখেছেন যে তার মৃত্যুর পর সিংহাসন তাকেই তিনি দিয়ে যাবেন। এখন তার এই আশা পূরণ করলেই হয়। তিনি সম্রাট হলে কী হবে, কোম্পানীকে না বলে তিনি কিছুই করতে পারেন না। আইনত তিনিই সম্রাট কিন্তু আসলে কোম্পানীই হলো হর্তা-কর্তা বিধাতা। কোম্পানী কিন্তু সম্রাটের এই আবেদন মানতে রাজী নন। পাগল আর কী? এ রকম একটা বদ মেজাজী লোককে গদীতে বসানো মানে খাল কেটে কুমীর আনা!

এদিকে সীটন সাহেবের পাইক বরকন্দাজ দেখে লাল কেল্লায় সোরগোল পড়ে গেলো। বেগতিক দেখে মির্জা জাহাঙ্গীরও আত্মসমর্পন করলেন। কোম্পানী আদেশ দিলেন, আর নয় এখানে। এলাহাবাদে যাও। সেইখানেই তোমার আস্তানা গাড়ো।

কোম্পানীর আদেশ মেনে নেন মির্জা জাহাঙ্গীর। সম্রাটের বড়ো দুঃখ যে এই ছেলেকে তিনি সিংহাসনে বসিয়ে যেতে পারলেন না।

এলাহাবাদে এসে মির্জা জাহাঙ্গীরের ভোল পাল্টে গেলো।

তার ব্যবহার দেখে তো সবাই অবাক। কী অমায়িক ভদ্রলোক, কণ্ঠস্বরে একটু তেজ নেই। অবাক কাণ্ড আর কী!

কোম্পানীর সাহেবেরাও ভাবলেন সিংহ এবার পোষ মেনেছে। তাই বেশ একটু খুশী হয়ে বললেন: নাহে শাহাজাদা। এলাহাবাদে থেকে তোমার কাজ নেই। দিল্লীতেই তুমি যাও।

কিন্তু দিল্লীতে এসে আবার যেই-সেই। সেই চোখ রাঙানি, সেই হুংকার।

এবার কোম্পানীর সাহেবেরা বেশ ভড়কে গেলেন। না, এমন একটা উপায় বের করতে হবে যাতে চিরদিনের জন্যে শাহাজাদা পোষ মেনে যান।

অতএব এবার এক নতুন ফন্দি হলো। এলাহাবাদে শাহাজাদাকে আবার পাঠানো হলো, আর সেইখানেই ......

সেইখানেই একদিন এক সাহেব এসে দেখা করলেন শাহাজাদার সঙ্গে। এসেই তাকে 'নজর' দিলেন এক বোতল শেরী-ব্রাণ্ডি। সদ্য বিলেত থেকে আমদানী করা হয়েছে।

'নজর' দিয়ে সাহেব বলেন: একটু পরখ করে দেখুন শাহাজাদা, একদম অমৃত। এমন জিনিস আপনি আর কোথাও পাবেন না।

এক চুমুকে শাহাজাদা বোতল শেষ করে দিলেন। খেয়ে তো বেজায় খুশী। বললেন: চমৎকার! এমনি জিনিস আর কক্ষনো খাইনি।

সাহেব হাসেন। বুঝলেন যে ওষুধ ধরেছে। অমৃত খেয়ে দেবতারা অমর হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সাহেবদের দেয়া 'অমৃত' খেয়ে মির্জা জাহাঙ্গীরের স্বর্গ-প্রাপ্তি হলো।

সাহেব চলে যাবার পর শাহাজাদা সব সময়ই শেরীর বোতল নিয়ে থাকেন। মাঝে মাঝে কোম্পানীর কর্তারা এসে দেখে যান ওষুদের ফলাফল।

প্রথমে শ্লীম্যান বলে এক সাহেব এলেন। তাকে জড়িয়ে ধরে শাহাজাদা বলেন ঃ শ্লীম্যান, তোমাদের দেশের সব চাইতে সেরা জিনিস হলো এই শেরী ব্রাণ্ডি। চমৎকার জিনিস। শুধ্ এর মাত্র একটি দোষ। বড্ডো তাড়াতাড়ি নেশা করিয়ে দেয়।

শ্লীম্যান বুঝতে পারেন যে শাহাজাদার দিন ঘনিয়ে এসেছে। বাড়িতে এসে কোম্পানীর কোলকাতার বড়ো সাহেবকে জানালেন মির্জা জাহাঙ্গীরের মৃত্যু আসন্ন। বড়ো সাহেব তখন হেস্টিংস্। তার কিন্তু শ্লীম্যানের কথা বিশ্বাস হলো না। তাই একদিন তিনি নিজেই এলেন শাহাজাদার কাছে।

শাহাজাদাকে দেখে হেস্টিংসও বুঝলেন যে আর বাকী নেই, আয়ু্ ফুরিয়ে আসছে।

ভেলভেটের পোশাক, সাটীনের চুড়িদার পায়জামা, মাথায় হীরে জহরৎ বসানো ফেজ টুপি পরে শাহাজাদা এসে দেখা করেন হেস্টিংসের সঙ্গে।

চোখে দীপ্তি নেই, কণ্ঠে নেই তেজ। লম্বা-লম্বা বাবরি চুল।

শাহাজাদা এসে বসেন হেস্টিংসের পাশে। এক, দু কথা থেকে হেস্টিংস আঁচ করে নিলেন যে, বিদ্রোহী শাহাজাদা মদ খেয়ে কাহিল হয়ে পড়েছেন। তাই খুশী হয়েই হেস্টিংস বাড়ি ফিরে যান। সত্যিই এমন একটা বিদ্রোহী লোক দিল্লীর

সিংহাসনে বসলে কোম্পানীকে কী বিপদেই না পড়তে হতো অবশ্যি কোম্পানী মির্জা জাহাঙ্গীরকে সম্রাট বলে মানতেন না, একথা ঠিক। কারণ তিনি তো আর সম্রাটের বড়ো ছেলে নন। সিংহাসনেরও আসল মালিক তো হলো সম্রাটের বড়ো ছেলে মির্জা আবুল জাফর।

মির্জা আবুল জাফর কবি শিল্পী। তিনি বসবেন দিল্লীর গদীতে।

তিন

অন্ধকার রাত।

যমুনা বয়ে যায় কুল কুল রবে।

নদীর পাড়ে বসে জলের কলতান শুনছেন কবি। সম্রাট আকবর শাহের বড়ো ছেলে, ভবিষ্যৎ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। তার সঙ্গে রয়েছেন তার সঙ্গী কবি জক্। দূর আকাশে নক্ষত্র ঝিকিমিকি করে। তারই পানে উদাস মনে তাকিয়ে আছেন কবি। তিনি অবাক হয়ে ভাবেন এই দুনিয়ায় কী প্রয়োজন হীরা জহরতের। এ সংসারে যার কোন স্থিতিই নেই, সে কেন ছুটবে আলেয়ার পেছনে। আজ বাদে কাল যার ডাক পড়বে খোদার কাছে, চলে যাবে ঐ সুদূর নক্ষত্রের দেশে, এই ঐশ্বর্য দিয়ে সে কী করবে ?

হঠাৎ যেন কবির তন্দ্রা ভাঙ্গে। বন্ধুকে তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ বলতে পারো জক্, কী রহস্য লুকিয়ে আছে এই দুনিয়ায়। ঐযে আসমানে দেখা যায় তারা, ও কে ? এই যে দুনিয়াকে ঘিরে রয়েছে অনন্ত, কোথায় এর শেষ ?

তিনি কবি, তিনি দার্শনিক। হৈ-হুল্লোরের চেয়ে নির্জনতাই তার পছন্দ। জনতার কলরবের চাইতে গালীবের গজল গানই তার কাছে মিষ্টি শোনায়।

বন্ধু বলেন ঃ শাহাজাদা, খোদা এই দুনিয়াকে তার বাগিচা বানিয়েছেন। আমাদের তিনি পাঠিয়েছেন এই দুনিয়ায় গাছ

পুঁতে ফল ধরাবার জন্যে। সেই গাছে ফল ধরানোই তো আমাদের কাজ। এই বাগিচার কী সার্থকতা, কী রহস্য আছে এর পেছনে, এ দিয়ে কাজ নেই। এ আমাদের অজানা।

বন্ধুর জবাব শুনে শাহাজাদার দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

এমনি ভাবে যায় দিনের পর দিন, সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা। যমুনার পাড়ে বসে কবি শাহাজাদা খোদাকে স্মরণ করেন। তাঁরই উদ্দেশে লেখেন কবিতা।

দিন কাটে, বছর যায়।

শাহাজাদা মির্জা আবুল জাফর ফকীর—এই কথাটা রাষ্ট্র হয়ে যায় রাজপুরীতে।

সম্রাটও এ কথা শুনতে পেলেন। শাহাজাদার চালচলনে তিনি বিরক্ত হলেন। শেষ পর্যন্ত কি দিল্লীর মসনদে বসবে একজন ফকীর বাদশাহ। অসম্ভব!

* * *

সত্যি এ চিন্তার বিষয়। না মির্জা আবুল জাফরকে দিয়ে রাজকাজ হবে না। তার চাইতে ছোট ছেলে মির্জা জাহাঙ্গীরই ভালো। সম্রাট তার মনের কথা খুলে জানালেন কোম্পানীকে।

এর মধ্যে কোম্পানীর সাহেবেরাও টের পেয়েছিলেন যে শাহাজাদা মির্জা আবুল জাফর ফকীর মানুষ। ফকির যদি সিংহাসনে বসে তা হলে তো তাদের অনেক সুবিধে।

অতএব সম্রাটের আবেদন তারা অগ্রাহ্য করলেন। বললেন: না, ওসব হবে না। ঐ ফকীর শাহাজাদাই হলো তোমার বড়ো

ছেলে। তাকেই আমরা বাদশাহ বলে মানবো। আর কাউকে নয়।

নিরাশ হলেন সম্রাট। কিছুদিন বাদে আবার ঐ আর্জি জানালেন কোম্পানীর কাছে।

কিন্তু সেই একই জবাব। সিংহাসন পাবার অধিকার মির্জা আবুল জাফরের, মির্জা জাহাঙ্গীরের নয়।

এমনি সময় একদিন খবর এলো এলাহাবাদে মির্জা জাহাঙ্গীর মারা গেছেন।

কোম্পানীর সাহেবদের স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়লো। তারা ভাবেন মস্তবড়ো হাঙ্গামা থেকে বাঁচা গেলো।

*　　　　*　　　　*

কয়েকদিন বাদে সম্রাট আকবর শা-ও মারা গেলেন।

শাহাজাদা মির্জা আবুল জাফর হলেন শাহানশা। কাব্য ছেড়ে রাজ্য তদারকের ভার নিলেন। মসীর বদলে হাতে নিলেন অসী।

কিন্তু কবি সম্রাটের চালচলনের হেরফের হয় না। তিনি সেই ফকীরই রয়ে গেলেন।

নিজের খরচপত্র কমিয়ে দিলেন। বললেন, যেমনি আয়, তেমনি ব্যয়।

কিন্তু বললে হবে কী? লাল কেল্লায় তখন সম্রাটের আত্মীয়-স্বজনে গিস্ গিস্ করছে। সদা সর্বদাই তাদের মুখে একই রব—

'আরো চাই।'

এই ঝামেলা থেকে সম্রাট কিন্তু নিজেকে সরিয়ে রাখেন। কবিতা আর কোরাণ, এই নিয়ে তার দিন কাটে শুধু তার সঙ্গে থাকে দুই সাথী, কবি জক্ ও হেকিম আসানুল্লা।

কিন্তু কিছুদিন বাদেই তার জীবনে অশান্তি ঘনিয়ে এলো। যে ঝামেলা থেকে তিনি নিজেকে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন সেই ঝামেলার আবর্তে তিনি পড়ে গেলেন।

কোম্পানীর সঙ্গে তার গোলমাল বাধলো।

* * *

শিকারে যাবে নাকি হেকিম?—সম্রাট তার বন্ধু-চিকিৎসক হেকিম আসানুল্লাকে প্রশ্ন করেন।

ঃ কোথায় যাবেন সম্রাট—জবাব দেন হেকিম।

ঃ ঐ নদীর পাড়ে। শুনেছি ওখানে নাকি রোজই অনেক তিতির পাখি বসে। চলো যাই।

বিকেল চারটে। এই সময়ে সম্রাট যে শিকারে বেরুবেন এ কিন্তু হেকিম কল্পনা করেন নি। সম্রাটের সঙ্গে তিনি কয়েকটা জরুরী বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে এসেছিলেন। অতএব শিকারে যাবার হাত থেকে এড়াবার ফন্দী বার করতে হয় হেকিমের। সম্রাটকে বলেনঃ দেখি আপনার নাড়ী। হুম, যা দেখলাম তাই। সম্রাট আপনার 'তবিয়ৎ' খারাপ। বলি, যে ওষুদ দিয়েছিলাম সেগুলো খাচ্ছেন তো। আজ আর শিকারে যাবেন না। সেদিন আর শিকারে যাওয়া হলো না।

কিন্তু সে অন্য কারণে। একটু বাদেই একজন সেপাই এসে জানালেন ঃ জাঁহাপনা বিপদ হয়েছে !

ঃ কী বিপদ ? ব্যস্ত হয়েই সম্রাট প্রশ্ন করেন।

ঃ জাঁহাপনা। আপনার মাহুত হাতী নিয়ে কেল্লার দিকে আসছিল। এমনি সময়ে দেখতে পায় একটা গাড়িতে দুজন কোম্পানীর সাহেব আসছেন। গাড়ি-ঘোড়া দেখে হাতী চমকে যায়। দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করে। গাড়ি পড়ে যায় একটা খানায়। সাহেবেরা নাকি চোট পেয়েছেন। আর সম্রাটের উপর বেশ রেগে গেছেন—সেপাই বললে।

কথাটা সত্যিই ভাববার বিষয়। সম্রাটের আর শিকারে যাওয়া হলো না। সেপাইকে ডেকে বললেন মাহুতকে ধমকে দিতে। তারপর হেকিমকে বললেন ঃ হেকিম, অনেকদিন ধরে ভাবছি তোমার সঙ্গে একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো। সময় আর হয়ে ওঠেনি। শুনেছো তো সব—

ঃ কী সম্রাট—হেকিম জবাব দেন।

ঃ ঐ তোমাদের কোম্পানী আর আমায় দিল্লীর সম্রাট বলে মানতে রাজী নয়। স্বীকার করতে চায় না যে তারা আমার প্রজা। বলে, মুঘল দরবারের বশ্যতা আর স্বীকার করবো না। রেসিডেণ্ট হকিন্স তাদের নাকি বলেছেন সম্রাটেরও যা অধিকার আমাদের কোম্পানীরও তাই। দুজনেই সমান সমান, কোন প্রভেদ নেই।

সম্রাটের কথা শুনে হেকিম চুপ করে থাকেন। তার বলবার কিছু নেই। কারণ কোম্পানীর সঙ্গে সম্রাটের

এই অধিকার নিয়ে রোজই ঝগড়া হচ্ছে এ কথা তিনি জানেন।

: আচ্ছা হেকিম, কোম্পানী আমায় 'নজর' দেওয়া বন্ধ করলে কেন হে? সত্যিই কি ওরা আমায় সম্রাট বলে স্বীকার করবে না। সেদিন কোম্পানীর মেটকাফ সাহেব এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে। সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন গ্রাহাম বলে তার আর এক কর্মচারীকে। মেটকাফ নজর দিলেন কিন্তু গ্রাহাম বলেন তিনি নজর দেবেন না। আমি রাগ করে গ্রাহামের সঙ্গে দেখা করিনি। বলেছি 'নজর' আমার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য। আগে দাও 'নজর' তবে দেখা করবো।

: কাজটা কিন্তু ঠিক করেননি সম্রাট, একটু ভয়ে ভয়ে জবাব দেন হেকিম।

: ভালো করিনি! তুমি বলো কী হেকিম? তুমি কি বলতে চাও আমি দুর্বল। কোম্পানীর চোখ রাঙানিতে আমি ভয় পাবো! কিছুতেই নয়। 'নজর' না দিলে আমি কোম্পানীর কর্মচারীদের কারু সঙ্গেই দেখা করব না, এই আমি তোমায় স্পষ্ট বলে দিলাম।

* * *

এই প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন সম্রাট বাহাদুর শা।

শাহানশার জিদের কথা কোম্পানীর সাহেবদের কানে গেল।

বুঝতে পারলেন চট করে সম্রাটকে 'নজর' বন্ধ করাটা ঠিক হয়নি। কিন্তু 'নজর' দিতে তাদের মন সরে না। কারণও

'নজর' দিলেই তো স্বীকার করে নেওয়া হলো, কোম্পানী সম্রাটের প্রজা।

কিন্তু কী করা যায়।

কলকাতার আর দিল্লীর সাহেবরা গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন। কী উপায়ে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়।

আর এই 'নজর' তো আজকের নিয়ম নয়। সেই জাহাঙ্গীরের আমল থেকে চলে আসছে। অবশ্য হেস্টিংস যখন কোম্পানীর বড় সাহেব ছিলেন, তখন তিনি একবার নজর দিতে আপত্তি করেছিলেন।

হেস্টিংস বলেন : আরে রেখে দাও তোমাদের বাদশাহ। আমার আর ঐ বাদশাহের একই পদমর্যাদা। বাদশাহকে নজর আমি দেবো না, কিন্তু এর বদলে তাকে মাসোহারা কিছুটা বাড়িয়ে দিতে রাজী আছি।

হেস্টিংস নজর দেয়া বন্ধ করলেন সত্য কিন্তু কোম্পানীর প্রধান সেনাপতি 'নজর' দিতে লাগলেন। প্রধান সেনাপতির হয়ে দিল্লীর রেসিডেণ্ট সাহেব এই 'নজর' সম্রাটকে দিতেন।

একদিন হকিন্স সাহেব এসে বললেন : কী অপমান! মুঘল সম্রাটকে আমরা কেন 'নজর' দেবো। ওসব চলবে না। বন্ধ করো 'নজর'।

'নজর' বন্ধ হলো।

এবার কিন্তু সম্রাটের জিদের কথা শুনে সাহেবরা একটু ভড়কে গেলেন। বিলেত থেকে কোম্পানীর কর্তারা বললেন :

না হে, সম্রাটকে আর চটিয়ে লাভ নেই। বরং ঐ 'নজর' দিয়েই যাও। এই বুড়ো অক্কা পেলে পর সমস্ত ব্যাপারটা আর একবার চিন্তা করে দেখবো'খন।

সাতসমুদ্দুর তেরো নদীর পার থেকে কর্তাদের আদেশ পাওয়া সত্ত্বেও এদেশের সাহেবরা 'নজর' দিলেন না।

* * *

কৈ হে আমার প্রাপ্য 'নজর' দিলে না। শুনলুম তোমাদের বিলেতের কর্তারা রাজী হয়েছেন 'নজর' দিতে—সম্রাট কোম্পানীর দিল্লীর রেসিডেন্ট সাহেবকে চিঠি লিখে জিজ্ঞেস করলেন।

কিন্তু কোন জবাব নেই। 'নজর'ও মিললো না, আর এদিকে কোম্পানীর কাছে মান সম্মানও গেলো।

আবার চিঠি লেখেন সম্রাট। জানান—'নজর' পাওয়া আমার বংশগত অধিকার। এ অধিকার থেকে আমি কেন বঞ্চিত হবো। কোম্পানীর বিলেতের কর্তারা আমায় নজর দেবার হুকুম দেয়া সত্ত্বেও আজ অবধি 'নজর' আমি কেন পেলাম না এর কারণ আমি জানতে চাই।

এবার জবাব এলো কোম্পানীর কলকাতা দপ্তর থেকে। ওরা জানালেন ঃ সম্রাট, গুজবে কান দেবেন না। 'নজর' সম্বন্ধে যা কিছু জানাবার পাকাপাকি ভাবে আমরাই আপনাকে জানাবো।

ব্যস্ ঐ পর্যন্ত। আর কোন কথা নেই।

চুপ করে গেলেন সম্রাট। হেকিমকে কোম্পানীর চিঠি দেখিয়ে সম্রাট বলেন : হেকিম, আবেদন করে কিছুই হবে না। এদের কাছে আবেদন আর 'অরণ্যে রোদন' একই কথা।

সম্রাটকে আশ্বস্ত করে হেকিম জবাব দেন : সম্রাট শিখদের সঙ্গে ইংরেজের লড়াই বেঁধেছে। এই লড়াই শেষ হলেই......

*　　　*　　　*

শেষ হলো শিখদের সঙ্গে লড়াই, কিন্তু কোম্পানী ও দিল্লীর বাদশাহের মধ্যে মনের মিল হলো না।

এবার কিন্তু গোলমালটা বেশ ভালো করে পাকিয়ে উঠলো।

সম্রাটের পর দিল্লীর গদীতে কে বসবে এই নিয়ে ঝগড়া। ছোট বেগম জিন্নৎমহল সম্রাটের প্রিয় মহিষী। বুদ্ধিমতী তিনি। বুঝতে পারলেন যে গদীতে এমনি কাউকে বসাতে হবে যিনি ইংরেজের মুখে মুখে জবাব দিতে পারেন। অতএব জিন্নতমহল বলেন সম্রাটের ছোট ছেলে জীবন বখৎই এ সিংহাসনে বসবার উপযুক্ত।

কিন্তু বেগমসাহেবা বললে তো হয় না। কোম্পানীর সাহেবদেরও মত চাই। আর এদিকে কোম্পানীর কর্তারাও স্পষ্ট বুঝতে পেরেছেন যে জীবন বখৎ সম্রাট হওয়া মানেই গোলমালের সৃষ্টি। সে কি কখনও হয়।

অতএব স্পষ্ট জবাব এলো, হবে না। গদীতে বসবে সম্রাটের বড়ো ছেলে ফকরুদ্দীন।

কোম্পানী গোপনে চুক্তি করলেন ফকরুদ্দীনের সঙ্গে। ফকরুদ্দীনের শ্বশুর মির্জা এলাহী বখ্‌স একদিন জামাইকে নিয়ে কুতুবে গেলেন। সেইখানে দলিলপত্র সই হয়ে গেল। ঠিক হলো সম্রাটের মৃত্যুর পর দিল্লীর গদীর মালিক হবেন ফকরুদ্দীন। শুধু একটি সর্তে। নতুন সম্রাট লাল-কেল্লা ছেড়ে দেবেন কোম্পানীর হাতে। অবশ্যি নতুন রাজার থাকবার জায়গা হবে কুতুবে। লাল-কেল্লার বড়ো প্রয়োজন কোম্পানীর। বারুদখানা তৈরী করতে হবে।

আসল কথা প্রজার কাছে বাদশাহকে থাকতে দে'য়া হবে না। এ হলো কোম্পানীর মতলব।

ফকরুদ্দীনের সঙ্গে কোম্পানী যে গোপন চুক্তি করেছে এ কথাটা জানাজানি হয়ে গেল। তারপর হঠাৎ একদিন শোনা গেলো শাহাজাদা ফকরুদ্দীন কলেরা রোগে মারা গেছেন।

আবার নতুন গোলমালের সৃষ্টি হলো।

সম্রাট ও জিন্নৎমহল দাবি করলেন যে জীবন বখৎই গদীতে বসবে।

কিন্তু এবারও কোম্পানী সম্রাটের এই অনুরোধ রাখলেন না।

এর মধ্যে কলকাতায় কোম্পানীর দপ্তরে বেশ অদল বদল হয়েছে। ডালহাউসীর জায়গায় ক্যানিং বড়ো সাহেব হয়ে এসেছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানালেন ওসব হবে না। আমরা ঠিক করেছি জীবন বখৎকে সিংহাসনে কোন মতেই বসতে দেবো না। সম্রাট মারা গেলে সিংহাসন পাবে তার জীবিত বড়ো

ছেলে মির্জা কোয়েশ। হ্যাঁ, তবে তাকে সম্রাট বলে ডাকা হবে না। বলা হবে শাহাজাদা। আর ঐ লাল-কেল্লার মায়াও তাকে ছাড়তে হবে। কুতুবে হবে তার স্থান।

বেশ দাপটেই ক্যানিং এ কথাগুলো সম্রাটকে জানালেন। তিনি জানতেন মির্জা কোয়েশ গদী পেলে কোন ঝামেলাই হবে না। যতো গোলমাল হবে জীবন বখৎ গদী পেলে পর। কোম্পানী এসময়ে কোন হাঙ্গামা চান না।

ছুদিন বাদে সম্রাট আবার এক আবেদন জানালেন কোম্পানীর কাছে।

বেগম জীন্নৎমহল ও জীবন বখতের জন্য তিনি একটা টাকা মাসোহারা করে দিতে চান। অতএব কোম্পানী যদি আপত্তি না করেন……

কিন্তু এবারও আপত্তি এলো। কোম্পানী সম্রাটকে জানালেন যে তার জীবিত অবস্থায় তিনি যতো খুশি টাকা এদের জন্যে বরাদ্দ করুন তাতে কোম্পানীর আপত্তি নেই কিন্তু তার মৃত্যুর পর কী হবে না হবে, এর কোন প্রতিশ্রুতি কোম্পানী দিতে পারেন না।

* * *

এমনি ভাবে প্রতি পদে-পদে কোম্পানীর কাছে সম্রাটকে লজ্জিত হতে হলো।

চুপ করে থাকেন সম্রাট। ভাগ্য তার হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে। তাই চুপ করে এ অপমান সহ্য করা ছাড়া উপায় কী!

* * *

দেওয়ানী খাসে সম্রাট বসে দাবা খেলছিলেন। এমনি সময় প্রহরী এক চিঠি নিয়ে এলো।

চিঠি খুলে পড়লেন সম্রাট। কাছেই ছিলেন বেগম সাহেবা জিন্নৎমহল।

ঃ কার চিঠি? বেগম সাহেবা প্রশ্ন করেন।

ঃ কোম্পানীর—

ঃ কি লিখেছে? আবার বেগম সাহেবা প্রশ্ন করেন।

ঃ সেই মামুলী কথা। অর্থাৎ তোমায় যে টাকাটা দেবো ভেবেছিলুম সেই টাকা দিতে রাজী নয় কোম্পানী।

ঃ কিন্তু আপনিই তো দিল্লীর সম্রাট। আপনার টাকা আপনি দেবেন, কোম্পানীর বলবার কী অধিকার আছে? বেগম সাহেবা বলেন।

কথাটা শুনে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে সম্রাটের। সত্যিই তো দিল্লীর গদীর মালিক তিনি। নিজের টাকা খরচ করবার অধিকার অবধি তার নেই।

আশ্চর্য!

চতুরা বেগম সাহেবা, কোম্পানীর এই অভদ্র ব্যবহারে তিনি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছেন যে কোম্পানীর নাগপাশ থেকে মুক্তি না পেলে কোন কিছুই করা যাবে না। কিন্তু কী করা যায়।

শুনুন সম্রাট। কোম্পানীর এই খাম-খেয়ালী আর সহ্য করা যায় না।

কিন্তু কী করবে তুমি। জানো তো আমি কতো নিরুপায়। আমি দিল্লীর সম্রাট বটে, কিন্তু আমার যে নেই সাম্রাজ্য, আমার যে নেই ক্ষমতা।

এবার একটু গম্ভীর স্বরেই বেগম সাহেবা বলেন—সম্রাট ঐ আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখুন। কিছু দেখতে পাচ্ছেন?

কৈ না তো—বিস্মিত হয়ে সম্রাট বলেন।

হ্যাঁ সম্রাট, আসমান ক্রমেই কালো হয়ে উঠছে, ঐ হলো তুফানের পূর্ব লক্ষণ। আমি আপনাকে স্পষ্ট বলে দিচ্ছি সম্রাট যে সারা হিন্দুস্থানে প্রবল তুফান উঠবে।

খোদা খোদা—অস্ফুট স্বরে সম্রাট বলেন। তাইতো, তুফান আসবে শিগ্‌গিরই। তাহলে এ তুফানে আমরা কে কোথায় যাবো, কোথায় হবে আমাদের ঘর, এ জানেন শুধু খোদা, শুধু খোদা

চার

বক-বকম···বক-বকম···বক-বকম···

নীল আকাশ ছেয়ে গেছে কবুতরে কবুতরে। কোনটা সাদা, কোনটা নীল। আর তাদেরই কলরবে মুখর হয়ে উঠেছে লক্ষ্ণৌ শহর।

'দিলখুসা' রাজপ্রাসাদে বসে লক্ষ্ণৌর নবাব ওয়াজিদ আলী শা কবুতরের এই বিচিত্র খেলা দেখছিলেন।

নবাব সাহেব শিল্পী। রাজদরবারের চাইতে দরবারী গান তার কাছে ভালো লাগে। রাজনীতির চাইতে তিনি দর্শন-নীতির বেশী তারিফ করেন।

তিনি চান নাচ-গান-কবিতা। প্রকৃতির এই সৌন্দর্যকে তিনি জীবন ভরে উপভোগ করতে চান। এই জীবনে প্রাণ আছে, এ মানুষকে ভুলিয়ে রাখতে পারে দিনের পর দিন।

আর রাজনীতি!

সে মানুষকে ভোগায় বছরের পর বছর···

ফুলের মতো নরম মন নবাব সাহেবের। কারুর দুঃখ কষ্টই তিনি সইতে পারেন না। চোখ রাঙিয়ে তিনি কথা বলতে জানেন না। লক্ষ্ণৌর গদীতে এমনি ভালো মানুষ আর কখনও বসেনি।

অল্পদিনের মধ্যেই কোম্পানীর সাহেবেরা নবাবের চাল-চলন বুঝে নিলেন। ব্যস, এবার ফন্দী করেন কী করে হটানো যায় নবাবকে গদী থেকে।

হেস্টিংস থেকে বেন্টিঙ্ক—বেন্টিঙ্ক থেকে ডালহাউসী, সবাই এ চক্রান্তে যোগ দিলেন। লক্ষ্ণৌর তোষাখানা হবে কোম্পানীর। তাই প্রথমে তৈরী হলো বিভীষণ-বাহিনী। রাজপরিবারে নবাবের আত্মীয়-স্বজনদের হাত করে নিলেন কোম্পানী।

রোজই গিয়ে এই বিভীষণ বাহিনী ইংরেজের দরবারে নালিশ জানায়ঃ আর তো সইতে পারিনে সাহেব। এবার একটা বিহিত করুন। এই যে সেদিন মহরমের মিছিলে নবাব সাহেব রাস্তায় বেলেল্লাপানা করলেন···ছিঃ ছিঃ, ভাবতেও লজ্জা হয়।

প্রজার সঙ্গে নবাবের এই মেলামেশা কিন্তু কোম্পানীর সাহেবদের পছন্দ হয় না। মহরমের মিছিলে নবাব সাহেব যান, কবি গান হবে তো নবাব উপস্থিত থাকবেন, গানের জলসা হবে তো নবাব হাজির। এটা ভালো লক্ষণ নয়।

তাই মনে-মনে ভাবেন কী করা যায়। কী করে বাগানো যায় লক্ষ্ণৌর গদী।

কিন্তু একটু মুশকিল আছে।

বহুদিন আগে···

*　　　*　　　*

বহুদিন আগে, মুঘল সাম্রাজ্যের তখন সবে মাত্র ভাঙ্গন ধরেছে, দিল্লীর উজীর সুজাউদ্দৌল্লা এসে লক্ষ্ণৌর গদীতে কায়েমী হয়ে বসলেন।

তারপর যা হয় তাই।

সুবাদার থেকে নবাব।

কিছুদিন বাদে, সুজাউদ্দৌল্লা হলেন খুন।

ব্যস্, কে বসবে লক্ষ্ণৌর গদীতে এই নিয়ে শুরু হলো ঝগড়া। মীমাংসা করতে এলেন কোম্পানী আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে মতলব আঁটলেন, অযোধ্যা আমাদের চাই।

তাই, নবাবের ক্ষমতা কমে তো কোম্পানীর প্রতিপত্তি বাড়ে।

বেন্টিঙ্ক তখন কোলকাতায় কোম্পানীর বড়ো সাহেব। বেশ জঁাকজমক করে একদিন তিনি লক্ষ্ণৌতে এলেন। এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করেন আর ভাবেন কী করা যায়। কোন্ উপায়ে নেয়া যায় অযোধ্যা। উপায় একটা আছে বটে—কোম্পানীর সঙ্গে ১৮০১ সালে নবাবদের এক চুক্তি হয়েছিল। সেই চুক্তিতে সর্ত ছিল যে, নবাবের শাসন যদি খারাপ হয় তা হলে কোম্পানী দেশের শাসনভারে হাত দিতে পারবে। অতএব বেন্টিঙ্ক সাহেব নবাবকে গিয়ে বললেন, সবই ভালো, কিন্তু দেশে দেখতে পেলুম বড্ডো অরাজকতা। শাসনের লাগাম যদি টেনে না ধরেন নবাব সাহেব, তা হলে কিন্তু বাধ্য হয়ে লক্ষ্ণৌর কাজকর্ম কোম্পানীকে দেখতে হবে।

কোলকাতায় ফিরে গিয়ে বেন্টিঙ্ক সাহেব নবাবকে এ কথা লিখে জানালেন।

এদিকে কোম্পানীর সাহেবদের মধ্যে রোজই বৈঠক বসে। তারা বলেন 'অযোধ্যা চাই'।

সাহেবরা কিন্তু অযোধ্যা নেবার অনেক মতলব এঁটে রেখেছেন। রাজত্ব জোর করে কেড়ে নেয়া যায়—কিংবা নবাবকে পাঠানো যায় নির্বাসনে। অথবা সাহেব কর্মচারী রেখে রাজত্ব

করা যায় বা নতুন নবাব গদীতে বসানো যায়, যে কোম্পানীর কথা শুনবে। কোন্‌টা সবচাইতে ভালো উপায়।

বেন্টিঙ্ক বললেন, না, রাজত্ব কেড়ে নেবো না, কিন্তু দেশের মালিক আমরাই হবো। ঐ অরাজকতার দোহাই দিয়েই এ দেশ দখল করতে হবে।

বেন্টিঙ্ক লিখলেন বিলেতের কর্তাদের কাছে। জানালেন, এই অরাজকতার দোহাই দিয়ে ১৮০১ খৃঃ-এর চুক্তি আমরা কাজে লাগাতে পারি।

কিন্তু বেন্টিঙ্কের যে কথাটা খেয়াল হয়নি বিলেতের বড়ো সাহেবদের সে কথাটা মনে জাগলো। তারা জানালেন : পাগল হয়েছো। অযোধ্যায় অরাজকতা এ শুনলে তো লোকে আমাদেরই দুষবে হে। দেশের পুলিশ, সৈন্য অধিকাংশ তো আমাদেরই। সবাই বলবে ওরা বসে বসে কী করছে! না, না, অরাজকতার দোহাই দিয়ে হবে না, একাজে বরং অন্য কোন ফন্দী বাতলাও। কী করা যায় এ নিয়ে বেন্টিঙ্ক যখন মাথা ঘামাচ্ছেন তখন সেই নবাব গেলেন মরে। গদীতে এসে বসলেন নবাবের কাকা।

কোম্পানীর বড়ো সাহেব তখন অকল্যাণ্ড। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি নবাবের সঙ্গে চুক্তি করলেন। এই চুক্তি ১৮০১-এর চুক্তি বাতিল করে দিলে। শুধু তাই নয়, ঠিক হলো ১৮০১-এর চুক্তির মতো কোম্পানীর দেশের ব্যাপারে হাত দেবার অতো ক্ষমতা থাকবে না। অর্থাৎ এই চুক্তিতে লাভ হলো নবাবের, ক্ষতি হলো কোম্পানীর।

কাগজপত্রে সই হবার পর কোম্পানীর বিলেতের সাহেবরা বুঝতে পারলেন যে এই চুক্তি তাদের পক্ষে নয়।

কিন্তু কী করা যায়। তাই সাহেবেরা ভাবলেন ঃ বেশ ভালো কথা। আমরা অস্বীকার করবো যে এইরকম কোন চুক্তিপত্রে সই করেছি। তাহলেই তো ল্যাঠা চুকে গেলো।

কয়েকটা বছরের জন্যে সাহেবরা চুপ করে গেলেন।

এমনি ভাবে দিন কেটে বছর যায়।

লক্ষ্ণৌর গদীতে এসে বসলেন নবাব ওয়াজিদ আলী শা।

নবাব সাহেব কবি, দার্শনিক, শিল্পী।

ইংরেজদের তাঁর বড্ডো অপছন্দ।

অতএব কোম্পানী আর নবাব সাহেবে যে ঝগড়া বাধবে এতে আর সন্দেহ কী।

একদিন কলকাতা থেকে কোম্পানীর বড়ো সাহেব এলেন লক্ষ্ণৌতে। নবাব সাহেব তাঁকে আদর যত্ন করলেন।

বড়ো সাহেব হেসে বললেন ঃ নবাব সাহেব আমি কিন্তু মিষ্টি কথা শুনতে আসিনি।

নবাব সাহেব তো অবাক। লোকটা বলে কী! এতো খাতির যত্ন করলেন, আর লোকটা স্পষ্ট তার মুখের উপর বলে দিলে যে, মিষ্টি কথা শুনতে তিনি লক্ষ্ণৌ আসেন নি। তাই একটু উৎকণ্ঠা মিশিয়ে নবাব প্রশ্ন করেন ঃ ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক বুঝতে পারলুম না।

ঃ শুনুন নবাব সাহেব, এই প্রদেশের চারিদিক ঘোরাফেরা করে বুঝতে পারলুম যে বিশৃঙ্খলা আর অরাজকতা বেশ ভালো ভাবেই

এখানে চলছে। এই সব বন্ধ করতে হবে। দু'বছরের সময় দিলাম আপনাকে। এর মধ্যে যদি এই বিশৃঙ্খলা দূর না হয় তা হলে লক্ষ্ণৌ-র ভার আমাদেরই নিতে হবে।

নবাব ভাবেন কী তার অপরাধ।

কোম্পানীর কর্তারা হাসেন। ভাবেন এবার লক্ষ্ণৌ-র তোষা-খানা আটকায় কে?

নবাবের অপরাধ অনেক।

প্রথম অপরাধ, নবাব সাহেব রোজ ভোরবেলা সৈন্যদের ড্রিল দেখতে যান। ঢালা হুকুম তিনি দিয়েছেন, যে সৈন্য আসবে না ড্রিল করতে তার জরিমানা হবে। এমন কি নবাব সাহেবেরও জরিমানা থেকে।

*　　　*　　　*

হুজুর—প্রহরী এসে কুর্নিশ কেটে নবাবকে বলে। ড্রিলে যাবেন নবাব। নিজের হাতে সৈন্য-বাহিনী গ[illegible]ছেন তিনি। এমন একটা সৈন্যবাহিনী তিনি গড়ে তু[illegible]বেন যাতে কোম্পানীর তাক লেগে যায়।

এ তার বহু পুরাতন শখ, বহুদিনের আশা। তাই রোজ রোজ তার ড্রিল করতে যাওয়া চাই।

সৈন্য গড়ে তুলবার আয়োজন দেখেই তো কোম্পানীর তাক লেগে গেলো। সর্বনাশ! নবাব ওয়াজিদ আলী গড়ে পিটে তৈরী করছেন নিজের সৈন্যবাহিনী। তাহলে আর রক্ষে নেই। এখন থেকে সতর্ক না হলে পরে আপসোস করতে

হবে। অতএব কোম্পানীর শ্রীম্যান সাহেব ছুটলেন নবাবের দরবারে।

কাজটা কিন্তু ভালো হচ্ছে না নবাব সাহেব—রেসিডেন্ট সাহেব বলেন।

ঃ কোন্ কাজটা শুনি—নবাব জিজ্ঞেস করেন।

ঃ এই যে শুনলুম আপনি নাকি এক সৈন্যবাহিনী গঠন করছেন। কথাটা কি সত্যি।

ঃ আপনি যা শুনেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। দেশে অরাজকতা দূর করতে হলে, আর শান্তি রাখতে হলে চাই ভালো সৈন্যবাহিনী। তাই ঠিক করেছি নিজের হাতে গড়ে তুলবো অযোধ্যার সৈন্য দল।

নবাবের কথা শুনে রেসিডেন্ট সাহেব তো অবাক। তিনি বলেন ঃ আহা আপনি আর কষ্ট করে সৈন্যবাহিনী তৈরী করছেন কেন? আমরা আছি কী করতে। আপনার সৈন্য দরকার, কোম্পানীর সৈন্য নিয়ে নিন। অবশ্যি এই সৈন্যদের মাইনে, থাকবার অন্যান্য খরচপত্র আপনাকেই দিতে হবে।

ভালো মানুষ নবাব সাহেব। রেসিডেন্ট সাহেবের কথা মেনে নিলেন। নিজের সৈন্যবাহিনী ভেঙ্গে দিলেন।

সাহেব মহলে সোয়াস্তির নিশ্বাস পড়লো।

* * * *

এর কিছুদিন বাদেই নবাব আর কোম্পানীতে আবার ঝগড়া বেধে গেলো। ঝগড়াটা এক তরফাই বলা যেতে পারে কারণ,

কোম্পানীই ঝগড়া করলেন—নবাব নয়।

কোম্পানীর নতুন মনিব হয়ে এসেছেন ডালহাউসী। তিনি খালি ফন্দী আটেন কী করে জব্দ করা যায় নবাবকে। একদিন ডালহাউসী লক্ষ্ণৌর রেসিডেন্ট শ্লীম্যানকে ডেকে বললেন: অযোধ্যা একটু ঘুরে দেখুন। কোথাও যদি একটু গলদ দেখতে পান জানাবেন। একটা বিহিত করতে হবে।

শ্লীম্যান দু বছর ধরে অযোধ্যা ঘুরে বেড়ালেন। দেখলেনও অনেক—আর লিখলেনও প্রচুর। ছোটখাটো গলদগুলোকে বেশ বড়ো করে লিখলেন। সবশেষে জানালেন যে রাজকাজে নবাবের মন নেই। কিন্তু শ্লীম্যান বুঝতে পেরেছিলেন যে অযোধ্যার শাসনভার কোম্পানীর নেয়া উচিৎ হবেনা। তাই ডালহাউসীকে সতর্ক করে জানালেন: যদি অযোধ্যা আমরা নিই, তা হলে হবে ঘোরতর অন্যায়।

* * *

কিন্তু ডালহাউসী সাহেবের এক গোঁ। 'অযোধ্যা নিতেই হবে।'

রোজই এ-নিয়ে তিনি তার পরামর্শদাতাদের সঙ্গে ঝগড়া করেন। অযোধ্যা নিয়ে তর্ক বিতর্ক কোম্পানীর সাহেবদের থেকে বাইরেও সাহেব মহলে ছড়িয়ে পড়লো।

কাগজে কাগজে এ নিয়ে খুব লেখালিখি সুরু হলো। শ্রীরামপুর থেকে তখন বেরোয় 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলে এক কাগজ।' রোজই সে কাগজে লেখা বেরোয় 'অযোধ্যা দখল

করতে হবে।' জর্জ্জ ক্যাম্পবেল বলে আর এক সাহেব বলতে লাগলেন ঃ শুধু্ অযোধ্যা নয়, সমস্ত দিশী রাজ্যই কোম্পানীর নিতে হবে।

ক'লকাতা থেকে বোম্বাই—বোম্বাই থেকে লণ্ডন। এই নিয়ে তর্ক বিতর্ক স্বুরু হয়ে গেলো। বিলেতের কাগজ-ওয়ালারাও এ নিয়ে মেতে উঠলেন।

কর্তারাও ভাবলেন আর নয়। অযোধ্যা এবার যেমনি করেই হোক নিতে হবে।

বড়োসাহেবেরা যা ভাবেন, ছোটসাহেবেরা আর এক ধাপ এগিয়ে যান। বড়োসাহেবরা যদি বলেন নবাবকে ধমকে দাও, তো ছোটসাহেবরা তাকে গ্রেপ্তার করেন। অতএব বিলেতের কর্তারা যেই ঠিক করলেন যে অযোধ্যার এবার একটা হিল্লে হওয়া দরকার, অমনি ছোট সাহেবরা সেটাকে দখল করে বসলেন।

* * *

'অযোধ্যা জোর করে ছিনিয়ে নেওয়া উচিৎ হবেনা' এই কথাই বার বার বলতে লাগলেন রেসিডেণ্ট শ্লীম্যান সাহেব।

শ্লীম্যানের দোটানা মন দেখে কোম্পানী বুঝলে যে শ্লীম্যানকে দিয়ে তাদের মৎলব হাসিল হবে না। অতএব তার জায়গায় পাঠান হলো বিলেত থেকে আনকোরা আমদানী উটরাম সাহেবকে।

শ্রীম্যান যে কাজ করতে সংকোচ বোধ করছিলেন, উটরামের সে কাজ করতে দ্বিধা হলোনা। তিনি একদিন কোম্পানীর পরোয়ানা নিয়ে হাজির হলেন নবাবের দরবারে।

*　　　*　　　*

গ্রীষ্মকাল। বড়োসাহেব লর্ড ডালহাউসী হাওয়া বদলাতে পাহাড়ে গেছেন।

নানা বুদ্ধি মাথায় খেলছে ডালহাউসী সাহেবের। রাজ্য কেড়ে নেবেন, না রাজাকে সরাবেন। যদি প্রজারা এ নিয়ে হৈ হল্লা করে! না এমন একটা কিছু করতে হবে যাতে সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙ্গে।

কাগজ কলম নিয়ে ডালহাউসী সাহেব লিখতে বসলেন, নীলগিরির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নয়, অযোধ্যার কোষাগারের কথা—নবাবের ভবিষ্যৎ।

তারপর সে কাগজ পাঠালেন বিলেতে বড়ো কর্তাদের কাছে। চার-চারটে উপায় তিনি ঠাউরেছেন। একটা কাজে লাগালেই হলো।

কয়েকদিন বাদে বিলেতের কর্তারা জবাব দিলেন।

*　　　*　　　*

জানুয়ারী মাস

নিজের ঘরে বসে ডালহাউসী বিলেতের কর্তাদের জবাব পড়ছেন। হুকুম এসেছে অযোধ্যা নিয়ে নাও।

এ ব্যাপার নিয়ে ডালহাউসী সাহেব তার পরামর্শদাতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবেন। তাই হেড অফিসের চিঠিটা মুখস্থ করছেন।

ডালহাউসী সাহেবের শরীর ক্লান্ত। কোম্পানীর সম্পদ বাড়াবার জন্যে এ-কয়েক বছর তিনি কী না করেছেন। নির্বিচারে স্বাধীন রাজ্যগুলো দখল করে নিয়েছেন ; রাজাকে সরিয়েছেন তার প্রাপ্য গদী থেকে, নাবালক উত্তরাধীকারীর মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছেন। এতো পরিশ্রমের পর বড়ো ক্লান্ত হবেন এতে আর আশ্চর্য্যের কী!

ডালহাউসী ছুটি চেয়েছেন। এদেশ থেকে তিনি বিদায় নিতে চান। কোম্পানীর কর্তারা জানিয়েছেন যে অযোধ্যার ল্যাঠা চুকে গেলেই তার মুক্তি। তাই ডালহাউসী ঠিক করেছেন অযোধ্যার একটা নিষ্পত্তি শিগ্‌গিরই করতে হবে। সমস্যার চৌদ্দ আনা তিনি সমাধান করে এনেছেন, এবার শেষ রক্ষা হলেই হলো।

পরদিন ডালহাউসী তার পরামর্শদাতাদের নিয়ে গোল হয়ে বসলেন। টেবিলের চারধারে ডোরিন, লো, গ্র্যান্ট সাহেবেরা বসে আছেন। সবার মুখেই চিন্তার ভাব। বিলেত থেকে হুকুম এসেছে নবাবকে সরাও, আর অযোধ্যা নাও। কিন্তু এ ভাবে অযোধ্যা জোর করে ছিনিয়ে নেয়া কি ঠিক হবে? কোন আইনের বলে তিনি এ কাজ করবেন। হ্যাঁ, উপায় একটা ছিল বটে। ঐ ১৮০১ খৃঃ

যে চুক্তি ছিল তার নজীর দিয়ে এ কাজটা করা যেতো। কিন্তু ১৮৩৭ খৃঃ চুক্তি তো আগের চুক্তিকে বাতিল করে দিয়েছে।

টেবিল চাপড়ে ডোরিন সাহেব বলেন ঃ বলি ঐ যে নবাবের রাজ্য দখল করছি—ওটা কোন আইনের সাহায্যে হবে শুনি।

লো সাহেব জবাব দেন ঃ কেন ঐ ১৮০১ খৃঃ যে চুক্তি ছিল সেই চুক্তি অনুযায়ী। ওতে তো স্পষ্ট বলা আছে আমাদের অযোধ্যা নেবার অধিকার আছে।

ডোরিন হেসে জবাব দেন ঃ কিন্তু আসল কথাটা নিশ্চয় ভোলনি লো। ১৮০১ খৃঃ চুক্তি বাতিল হয়ে গেছে। লর্ড অকল্যাণ্ড ১৮৩৭ খৃঃ যে দলিল সই করেছিলেন তাতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে ১৮০১ খৃঃ চুক্তি বাতিল করা হলো। অতএব ঐ পুরানো চুক্তি কাজে খাটানো যাবে না।

লো জবাব দিলেন ঃ আরে রেখে দাও তোমার ১৮৩৭ খৃঃ চুক্তি। ও চুক্তি তো বিলেতের কর্তারা সই করেননি—

গ্র্যাণ্ট আর ডোরিন সবিস্ময়ে চীৎকার করে বলেন ঃ তাই নাকি।

এবার ডালহাউসী জবাব দেন। বলেন, অযোধ্যা নেবার সব চাইতে ভালো পন্থা ঐ আগের চুক্তি। অতএব ১৮৩৭ খৃঃ চুক্তি যে সই হয়নি একথা বলা ছাড়া উপায় নেই। বলতে হবে ১৮০১ খৃঃ চুক্তি বাতিল হয়নি।

এবার গ্র্যাণ্ট বলেন ঃ কিন্তু নবাব সাহেবকে তো কখনও জানান হয়নি যে আমাদের মনিবেরা অকল্যাণ্ডের সেই খসড়া সই করেননি। জানানো উচিৎ নয় কি ?

এবার জানাবো—ডালহাউসী বললেন।

এ ক্ষেত্রে তার কী কর্তব্য সে ডালহাউসী ভালো করেই জানতেন। অযোধ্যা নেবার সব কাজই তিনি শেষ করে রেখেছেন। সৈন্য-সামন্ত, চুক্তিপত্র, ঘোষণা-পত্র, ইত্যাদি ইত্যাদি। এবার এগুলোকে কাজে লাগালেই হয়।

কিন্তু কে একাজ করবে? শ্রীম্যান দুর্বল, তাঁকে দিয়ে হবে না। উটরাম সবেমাত্র বিলেত থেকে এসেছে। অতএব তাকেই পাঠান হোক এ কাজের দায়িত্ব দিয়ে।

অতএব উটরাম একদিন সদলবলে এসে হাজির হলেন লক্ষ্ণৌতে।

* * *

'এ দলিলটায় সই করুন নবাব সাহেব'। নবাবের হাতে একটা কাগজ এগিয়ে দিলেন কোম্পানীর দূত উটরাম। এই দলিলে লেখা আছে নবাব ওয়াজিদ আলী শা স্ব-ইচ্ছায় অযোধ্যার শাসনভার কোম্পানীর হাতে তুলে দিচ্ছেন।

দরবারে ভাই আর উজীর আলীনকী খাঁকে নিয়ে বসে আছেন নবাব সাহেব। এমনি সময় উটরাম কোম্পানীর পরোয়ানা নিয়ে এলো।

উটরাম আসছেন, এ খবর নবাব আগেই জানতে পেরেছিলেন। আর শুধু কি তাই। উটরাম কী দুঃসংবাদ নিয়ে আসছেন এটাও নবাবের অজানা নেই।

ফেব্রুয়ারী মাস। লক্ষ্ণৌতে তখনও শীতের আমেজ আছে।

তুই সঙ্গী হেইস ও ওয়েষ্টার্ণকে নিয়ে উটরাম এলেন লক্ষ্ণৌর দরবারে।

উটরাম যেই দিলখুসা প্রাসাদের দরজায় পা দিয়েছেন অমনি সমস্ত রাজপুরীর চেহারা পাল্টে গেলো। দ্বার ছেড়ে দাঁড়ালো সেপাই। সবার মুখই হয়ে গেলো গম্ভীর।

ঃ সই করুন দলিলটায় নবাব সাহেব—উটরামের ডাকে নবাবের যেন তন্দ্রা ভাঙ্গে।

কী যে তিনি সই করবেন। অযোধ্যার গদী তাকে ছেড়ে দিতে হবে। কী তার অপরাধ।

অপরাধ, তুমি ইংরেজ বিদ্বেষী নবাব সাহেব। তোমার অপরাধ—নবাব ওয়াজিদ আলী শা, তুমি ইংরেজকে এদেশ থেকে তাড়াতে চাও। আরো তোমার অপরাধ যে শস্য-শ্যামলা অযোধ্যা তুমি আজ অবধি কোম্পানীর হাতে তুলে দাওনি। নবাব তুমি সঙ্গীত-পিয়াসী, তুমি কবি, তুমি দার্শনিক—কিন্তু রাজনীতি তোমার জানা নেই। তাই আজ কোম্পানীর দাবার চালে তুমি হেরে গেলে।

ঃ ও কাগজে আমি সই করবো না—দৃঢ়কণ্ঠে নবাব উটরামকে জানালেন।

উটরাম কিন্তু বড়ো আশা নিয়ে এসেছিলেন। এভাবে নবাব যে তাকে নিরাশ করবেন এ তিনি কল্পনা করেননি।

ঃ এ কাগজে সই না করলে কোম্পানীকে বাধ্য হয়ে ঘোষণা করতে হবে যে অযোধ্যার শাসনভার তারা জোর করে নিচ্ছে—কর্কশ কণ্ঠে উটরাম বললেন।

: তাই করুন। জোর করে কোম্পানী ছিনিয়ে নিতে চায় আমার সম্পত্তি, তাই নিক। কোম্পানীর কাছে আমি কোন ভিক্ষেই চাইবো না। নিজের জন্য কোন টাকা-পয়সাই আমি দাবি করবো না।...

বলতে বলতে নবাবের গলা ধরে এলো। চোখ হলো অশ্রুসিক্ত।

লক্ষ্মৌর নবাব, সুজাউদ্দ্দুল্লার বংশধর, নবাব ওয়াজিদ আলী শা শিশুর মতো কেঁদে ফেললেন।

তারপর মুকুট খুলে দিলেন উটরামের হাতে। বললেন: উটরাম, অযোধ্যার গৌরব আজ তোমরা ছিনিয়ে নিলে। এই নাও মুকুট।

নিঃশব্দে উটরাম সেই মুকুট গ্রহণ করলেন। অযোধ্যার ইতিহাসে একটা যুগ শেষ হয়ে গেলো। যবনিকা পড়লো খান্দানী বংশের গৌরবে।

* * *

'অযোধ্যা কেড়ে নিচ্ছে কোম্পানী' এ খবরটা গেলো নবাবের মা, বেগম সাহেবার কানে।

তিনি গর্জে উঠলেন। বললেন: কার এতো স্পর্দ্ধা এ বংশের মুকুট কেড়ে নেয়।

ডালহাউসীর চোখ রাঙানিতে তিনি ভয় পেলেন না। তিনি শেষ অবধি লড়ে দেখবেন দুনিয়ায় বিচার পাওয়া যায় কি না।

তিনি এদিক ওদিক বিস্তর তদ্বির করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না।

তাই একদিন অন্ধকার রাত্রে পাড়ি দিলেন দূরে—সাগর পারে। বিলেতে রাণীসাহেবার দরবারে গিয়ে তিনি এর একটা চূড়ান্ত মীমাংসা করবেন। অন্যায়ের প্রতিবিধান চাই—এই তার দাবি।

* * *

কলকাতার গার্ডেন রীচের বাগানবাড়ি। সামনেই গঙ্গা।

লক্ষ্ণৌর গদী থেকে বিতাড়িত হয়ে এসে এই বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন নবাব ওয়াজিদ আলী শা। তার সঙ্গে রয়েছেন আলী নকী খান—তারই বিশ্বস্ত বন্ধু।

কোম্পানীর ব্যবহারে নবাব দুঃখ পেয়েছেন। তার অমন সাধের দিলখুসা প্রাসাদকে ভেঙে ফেলেছে কোম্পানীর কর্ম-চারীরা। তার বাগান—সাজানো ঘর, সব নষ্ট করে দিয়েছে। রাজপ্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে নবাবের আত্মীয়দের। প্রতিবাদ তিনি করেছিলেন কিন্তু কে কার কথা শোনে। আজ অবধি তার চিঠির উত্তর দেয়নি কোম্পানী।

সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এসেছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে নবাব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখছেন। হঠাৎ আলী নকী খাঁকে ডেকে বললেন—আলী নকী, আশমানে কিছু দেখতে পাচ্ছো—

কৈ না তো।—জবাব দেন আলী নকী।

না আলী নকী। ঐ পশ্চিম দিকে তাকিয়ে দেখো। দেখতে পাচ্ছো এক টুকরা মেঘ। আলী নকী, আমি তোমায় স্পষ্ট বলে দিচ্ছি তুফান আসবে।

পাঁচ

এর কিছুদিন আগে।

কানপুরের পলো ময়দানে খেলতে খেলতে বিঠৌরের নানা সাহেব একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন।

হ্যাঁ, কি ভাবছিলেন নানা সাহেব। পেশোয়া বাজী রাও'র দত্তক পুত্রকে স্বীকার করে নিতে রাজী নয় কোম্পানী।

এ কথাটা ভাবতেই যেন বিস্ময় লাগে। সাহেবেরা তো তার পরম বন্ধু। রোজই তার বাড়িতে সাহেব মেম সাহেবের দল বেড়াতে আসে। কতো গল্প, কতো হাসিঠাট্টা হয়। কোম্পানীকে তিনি কতো সাহায্য করেছেন। কিন্তু আজ ঐ সাহেবের দল কেন তাকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চায়? কি তাদের অভিপ্রায়? যাদের তিনি পরম বন্ধু বলে ভেবেছিলেন, সত্যিই কী তারা বন্ধু। একথা ভাবতেও যেন অবাক লাগে নানা সাহেবের।

সাহেবদের সঙ্গে নানা সাহেব রোজই পলো খেলেন। আজ কাল অবশ্যি তিনি ময়দানের বাইরেও সাহেবদের সঙ্গে খেলতে সুরু করেছেন। তবে সেটা পলো নয়—রাজনীতি।

সবাই বলে বিঠৌরের নানা সাহেব ইংরেজদের পরম বন্ধু।

* * *

বহুদিন আগে মাধব রাও বলে এক ব্রাহ্মণ একটি আড়াই বছরের ছেলেকে নিয়ে বাজী রাও'র দরবারে আসেন। নিরালায় নিঃসঙ্গে বাস করেন বাজী রাও। তার নিজের কোন ছেলে নেই। মাধব রাও'র শিশুপুত্রকে দেখে তার বড়ো ভালো লাগলো। তিনি তাকে দত্তক নিলেন। নাম রাখলেন দন্ধু পন্থ। সবাই ডাকে নানা সাহেব বলে।

দিন যায়। নানা সাহেব বড়ো হলেন। খেলাধূলা, দৌড়-ঝাপ সবই তার জানা। দিনগুলো তার সুখেই কাটে। কিন্তু হঠাৎ একদিন সে জীবনে দুঃখ এসে হানা দিলে। বাজী রাও মারা গেলেন।

মারা যাবার সময় বাজী রাও তার উত্তরাধিকারী করে গেলেন তার দত্তক পুত্র নানা সাহেবকে।

কোম্পানী কিন্তু এই দত্তক পুত্রকে উত্তরাধিকারী বলে মানতে রাজী হলেন না। অতএব একটা গোলমাল বাধলো। নানা সাহেব আর্জি করেন যে তিনি হলেন আইনসঙ্গত দত্তক পুত্র। অতএব বাজী রাও'র সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবার হক। কিন্তু কোম্পানী অস্বীকার করেন।

কথাটা কমিশনার থেকে গভর্ণর টমসন সাহেব, সেখান থেকে কোম্পানীর কলকাতার বড়ো সাহেব ডালহাউসীর কাছে গেলো।

ডালহাউসী স্পষ্ট জবাব দিলেন : হবে না। তোমার এ দাবি আমরা মানবো না।

টমসন সাহেব বলেন : পাগল আর কি। এদেশে আর স্বাধীন রাজ্য থাকতেই দেয়া হবে না।

নানা সাহেব বহু আবেদন করলেন কিন্তু তার সব আবেদনই বিফলে গেলো।

নানা সাহেব ভাবেন কী করবেন। ঠিক এমনি সময় একদিন হঠাৎ……

*　　　*　　　*

…হঠাৎ তার দেখা হলো কানপুরের এক স্কুল মাস্টারের সঙ্গে। নাম তার আজিমুল্লা খাঁ।

এই আজিমুল্লাই সর্বপ্রথম দিলেন নানা সাহেবের কানে স্বাধীনতার মন্ত্র। ইংরেজের হাত থেকে মুক্তি চাই।

কে এই আজিমুল্লা খাঁ।

অপূর্ব তার জীবনী, অপূর্ব্ব তার দক্ষতা। গরীবের ঘরে প্রথম দিকটা কাটিয়েছেন। খাবার নেই, পোশাক নেই, টাকা নেই, তবু নিজের অধ্যবসায়ে আজিমুল্লা লেখাপড়া শিখলেন। ইংরাজী ও ফরাসী ভাষার খৈ ফুটতো তার মুখে। বাবুর্চি থেকে হলেন স্কুলের মাস্টার।

আজিমুল্লার দক্ষতার কথা নানা সাহেবের কানে গেলো। তিনি পাঠালেন আজিমুল্লাকে বিলেতে। কোম্পানীর বড়ো কর্তাদের কাছে তার আর্জি নিয়ে। ডালহাউসী সাহেব যে অন্যায় করেছেন নানা সাহেবের উপর তার বিচার চাই। কিন্তু আজিমুল্লা কি জানতেন যে কোম্পানীর কলকাতার বড়ো সাহেব আর বিলেতের কর্তারা একই সূতোয় গাঁথা।

অতএব আজিমুল্লা নানা সাহেবের হয়ে যতো আবেদন করেন তা ব্যর্থ হয়ে যায়। বিডেল বলে এক উকীলকে পাকড়াও করলেন আজিমুল্লা। এবার তুজনে মিলে কোম্পানীর দপ্তরে ধর্ণা দিলেন। কিন্তু ঐ একই ফল—'কিছুই হবে না। নানা সাহেবকে বাজী রাও'র উত্তরাধিকারী বলে মানবো না।'

দিনগুলো এমনি ভাবে কেটে যায়। হোটেল, ক্লাব, বড়ো-বড়ো ঘরে যাতায়াত করেন আজিমুল্লা। কতো মেয়ে তার প্রেমে পড়ে ইয়ত্তা নেই।

অমন চমৎকার ফরাসী ভাষা যিনি বলতে পারেন তার যে ইংরেজ সমাজে আদর হবে এতে আর আশ্চর্য কী?

হঠাৎ একদিন কোম্পানীর দপ্তরের সামনে আজিমুল্লার সাক্ষাৎ হলো রঙ্গ বাপুজী নামে এক ভারতবাসীর সঙ্গে।

রঙ্গ বাপুজীকে দেখলে শ্রদ্ধা হয়। গম্ভীর, শান্ত, সৌম্য তার চেহারা। রাশভারী কণ্ঠ।

রঙ্গ বাপুজীকে আজিমুল্লা প্রশ্ন করেন ঃ আপনি ? এমনিভাবে দিনের পর দিন আপনি কোম্পানীর দ্বারে ধর্ণা দিচ্ছেন কী জন্যে!

"আমি বিচার চাই"—শান্ত কণ্ঠে রঙ্গ বাপুজী জবাব দেন।

বিচার! কিসের বিচার ?—

বিস্মিত হয়ে আজিমুল্লা প্রশ্ন করেন।

আমার দেশ সাতারার বিচার। কোম্পানী ছিনিয়ে নিয়েছে আমার দেশ—কেড়ে নিয়েছে সাতারার মান, মর্যাদা। আমি জানতে চাই সাহেবদের কাছ থেকে কোম্পানী সাতারা ফিরিয়ে দেবে কিনা। কিন্তু আপনি কে ?

রঙ্গ বাপুজীর কথা শুনে আজিমুল্লার হাসি পেলো। বললেন ঃ বিচার চাইছেন কোম্পানীর কাছ থেকে। অবাক করলেন আপনি। আমিও এসেছিলাম ওদের কাছে বিচার চাইতে। আপনি চান সাতারার মান মর্য্যাদা ফিরিয়ে আনতে, আমি চাই বিঠৌরের গদীতে আমার মনিব নানা সাহেবকে বসাতে। কিন্তু বন্ধু আমরা হেরে গেছি। আপনি হারিয়েছেন সাতারা, আমি হারিয়েছি বিঠৌরের গদী। চলুন দেশে ফিরে যাই।

আজিমুল্লা দেশে ফিরে এলেন। আসবার পথে একবার ক্রিমিয়ার লড়াই দেখে এলেন। দেখতে পেলেন সেখানে ইংরেজদের দুরবস্থা। তাহলে কী……

কী হবে—জিজ্ঞেস করেন নানা সাহেব।

উপায় একটা আছে।

কী সে উপায়, শুনি—শুধালেন নানা সাহেব।

ইংরেজদের সঙ্গে লড়তে হবে—

জবাব দিলেন আজিমুল্লা। বিনা লড়াইতে কিছুই পাওয়া যাবে না, এ আমি আপনাকে স্পষ্ট বলে দিচ্ছি।

ছয়

'মেরী ঝাঁসী নহী তুঙ্গী—' বললেন ঝাঁসীর রাণী লছমী বাই।

সারা হিন্দুস্থানে প্রতিধ্বনিত হলো এই চারটি শব্দ 'মেরী ঝাঁসি নহী তুঙ্গী'। কোম্পানীর সাহেবরা তো অবাক।

সামান্য একটা মেয়ে তার কিনা এতো সাহস। ঝাঁসী দেব না।

'ধর্ম আমায় দিয়েছে পোষ্যপুত্র নেবার অধিকার। কোম্পানীর কোন ক্ষমতা নেই এই অধিকার কেড়ে নেবার। আমি জীবন দেবো কিন্তু অধিকার দেবো না।'

ঝাঁসীর রাণী লছমী বাইর কথা শুনে কোম্পানী সত্যই ভাবনায় পড়লেন। তারা চিঠিতে লিখে জানালেন ঝাঁসীর চারদিকে আছে কোম্পানীর সম্পত্তি। অতএব ঝাঁসী পেলে সুবিধে হয়। একদিন কোম্পানী ঝাঁসীর রাজাদের এই দেশটা জায়গীর দিয়েছিলেন। এ জায়গীর যদি তারা ফিরিয়ে নিতে চা'ন তা'হলে কোন অন্যায় হবে না। আর জায়গীরদারীর গদীতে দত্তক পুত্রের বসবার ক্ষমতা আছে কিনা সেটা বিচার করবেন কোম্পানী, রাণী সাহেবা ন'ন।

মিথ্যে কথা। ঝাঁসী জায়গীরদারী নয়। ঝাঁসী স্বাধীন এলাকা। কোম্পানীর মেটকাফ সাহেব বলে গেছেন স্বাধীন রাজ্যের গদীতে দত্তক পুত্রের বসবার অধিকার আছে। এ অধিকার আমি কিছুতেই ছাড়বো না। 'মেরী ঝাঁসী নহী তুঙ্গী' —জবাব এলো ঝাঁসীর রাণীর কাছ থেকে।

এই সেই রমণী যার কীর্তি আজো সারা হিন্দুস্থানে অমর হয়ে আছে।

*   *   *

ঝাঁসীর রাণী লছমী বাই। ভারতের গৌরব—

কাশী শহরে মোরপত তাম্বে বলে এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। তার এক মেয়ে, চমৎকার চেহারা, গৌর বর্ণ রং, টিকালো নাক, উঁচু ললাট, সবই তার বীরত্বের ব্যঞ্জক।

বাবা ডাকেন ছবীলী বলে। পাড়াপ্রতিবেশীরা বলে মুন্না।

অসম সাহসী ছবীলী। লাঠি খেলা, বন্দুক ছোড়া, ঘোড়ায় চড়ায় রপ্ত। চারদিকে ছবীলীর নাম ছড়িয়ে পড়লো। ছবীলী বড়ো হলো। বাবা চিন্তা করেন মেয়ের বিয়ের। ঝাঁসীর রাজা তখন গদাধর রাও। একদিন তারই সঙ্গে ছবীলীর বিয়ে হয়ে গেলো। ছবীলী থেকে তার নাম হলো রাণী লছমী বাই।

গদাধর রাওর পূর্বপুরুষ ছিলেন রামচন্দ্র রাও। কোম্পানীর সঙ্গে তার খুব ভাব। কিন্তু কিছুদিন বাদে অপুত্রক অবস্থায় রামচন্দ্র রাও মারা গেলেন। গদীতে কে বসবে এই নিয়ে ঝগড়া। কোম্পানী রাজার এক কাকাকে গদীতে বসালেন। কাকাও নিঃসন্তান। অতএব তার মৃত্যুর পর ঝাঁসীর গদীতে বসলেন লছমী বাই-র স্বামী গদাধর রাও।

কিছুদিন বাদে আবার সেই বিপদ। গদাধর রাও-ও নিঃসন্তান। অতএব তিনি দত্তক নিলেন। কিন্তু গদাধর রাও মারা যাবার পর কোম্পানী দত্তক পুত্রকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করলেন।

কিন্তু রাণীমা লছমীবাই বললেন ঃ হবে না। আমার দত্তক পুত্রকে স্বীকার করে নিতে হবে কোম্পানীর।

স্বামী মারা যাবার পর এই নাবালক পুত্রের হয়ে রাণী লছমীবাই শাসন কাজ চালাচ্ছিলেন। একটুও বেগ পেতে হয়নি তাঁকে রাজকার্য চালাতে। কী কঠোর পরিশ্রম করতে পারেন তিনি—

শাসনভার দেখা, পূজো করা, গরীবদের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা শোনা, এই ছিল তাঁর দৈনন্দিন কাজ।

শুধু কি তাই।

তিনি রোজ ভোরে উঠে ব্যায়াম করতেন। ঘোড়ায় চড়ে রাজ্যের নানাদিক ঘুরে আসতেন। তারপর স্নান, পূজো। তাঁর আর একটা প্রিয় কাজ ছিল গান শোনা। সঙ্গীতের তিনি ছিলেন বড়ো সমঝদার। এ হেন নারীর হাতে শাসনভার থাকলে কোম্পানীর চোখ টাটাবে, এতে আর সন্দেহ কী।

তাই ভাবেন কী করে নাবালক পুত্র দামোদর রাওকে গদী থেকে বঞ্চিত করা যায়। ঝাঁসীর রাণীর অধিকার কী করে কেড়ে নেয়া যায়।

ডালহাউসী যেদিন ঝাঁসী কেড়ে নিলেন সেদিন রাণী লছমীবাই তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। কোম্পানী কিন্তু আর একটা কারসাজী করলেন। রাজ্য কেড়ে নেবার পর রাণীসাহেবাকে একটা মাসোহারা দিয়েছিলেন। এই মাসোহারা বরাদ্দ করেই কোম্পানী সে টাকা থেকে একটা মোটা অংশ কেটে নিলেন। বললেন 'রাজাসাহেবের দেনা ছিল। সেই বাবদই টাকা কেটে নিচ্ছি।'

সাত

এমনি ভাবে গেলো ঝাঁসী, সাতারা, অযোধ্যা, নাগপুর। দিন যতোই যায়, কোম্পানীর সম্পত্তি বাড়ে। আর বাড়ে সমস্ত হিন্দুস্থানে অসন্তোষ।

চারদিক থেকে যখন উঠছে প্রতিবাদ, তখন কলকাতার দপ্তরে বসে ডালহাউসী সই করছেন কাগজে—নাও সাতারা, বন্ধ করো রাজার মাসোহারা—সরিয়ে দাও নবাবকে।

তারপর একদিন সেই প্রতিবাদ হিন্দুস্থানের ঘরে ঘরে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো।

এই সোনার দেশে উঠলো কালো মেঘ। বইল কালবৈশাখী ঝড়ের হাওয়া।

ঘরে ঘরে আগুন জ্বালাতে হবে। ভারতবাসীর মনে দিতে হবে স্বাধীনতার বাণী।

কে জ্বালাবে এই আগুন, কে দেবে এই বাণী। কে বলবে দেশকে যে বিপদ ঘনিয়ে আসছে।

এগিয়ে এলেন ফয়জাবাদের আহামুল্লা সাহেব।

লম্বা চেহারা, সাহসী, কর্মঠ আর আছে অসাধারণ ক্ষমতা।

অযোধ্যা যখন কোম্পানীর হাতে চলে গেলো তখন এই আহামুল্লা সাহেব অসন্তোষের বীজ নিয়ে গেলেন গ্রাম থেকে গ্রামে, শহর থেকে শহরে।

কতো সহজে মানুষের মনে বিপ্লবের মন্ত্র দেয়া যায়, কী করে মানুষের মনে চেতনা জাগানো যায়, ভাবেন আহামুদুল্লা। অতএব তিনি এক ফন্দী বার করলেন। খবর পাঠাতে লাগলেন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। 'দেশে বিপদ ঘনিয়ে আসছে, তোমরা তৈরী হও, প্রস্তুত হও হাতিয়ার নিয়ে, ঐ জ্বলছে লড়াইর আগুন। ওতে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।'

১৮৫৭ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে উত্তরপ্রদেশের এক গাঁয়ে। এক থানার চৌকীদার অন্য গাঁয়ের থানায় দৌড়ে গেলেন। তার হাতে রয়েছে দুটুকরো চাপাটি।

বানাও দেখি এ রকম আরো দশখানা চাপাটি। চাপাটিখানা দুটুকরো করে বন্ধুদের হাতে দিয়ে চৌকীদার বললেন।

কী করবে হে দশখানা চাপাটি দিয়ে।—সবাই প্রশ্ন করে।

মজাটা দ্যাখোই না--চৌকীদার জবাব দেয়।

চৌকীদারের কথামত আরো দশখানা চাপাটি তৈরী হলো। তারপর সেই চাপাটি বন্ধুদের হাতে এক একখানা করে তুলে দিয়ে চৌকীদার বললেনঃ নিয়ে যাও এই চাপাটি পাশের গ্রামে। তাদের বলবে যেন এইরকম আরো চাপাটি তৈরী করে দেশের বিভিন্ন জায়গায় পাঠান হয়।

এই ভাবে চাপাটি পাঠান হলো, গ্রাম থেকে গ্রামে। লক্ষ্ণৌ থেকে দিল্লী---দিল্লী থেকে পাঞ্জাব, দেশ থেকে দেশান্তরে।

সেই চাপাটি হাতে করে আসেন গাঁয়ের মোড়ল। তারপর দশজনার সামনে দু টুকরো করেন।

হঠাৎ কৌতূহলী প্রশ্ন করে—বলি, মোড়ল ভায়া। এই চাপাটিতে কী আছে গো ?

জানো না বুঝি এই চাপাটি পাঠাবার কী মানে ?

কৈ নাতো—হয়ত সবাই বলে।

শোন। আমাদের বাপ ঠাকুর্দার আমল থেকে এক রেওয়াজ চলে আসছে। দেশের রাজা যখন লড়াই করতে তার প্রজাকে ডাকবেঁন, তখন তিনি পাঠাবেন চাপাটি প্রজাদের কাছে। যে এই চাপাটি হাতে নেবে তাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে মালিকের হয়ে লড়বো আমি।

বেশ বুঝলুম। কিন্তু কী আদেশ পাঠিয়েছেন মালিক। কার সঙ্গে লড়তে হবে। কবে—কোথায় ? জনতাকে শান্ত করে মোড়ল বলেন ঃ ধীরে বন্ধু ধীরে। এখনও যে লড়াইর সময় হয়নি। প্রতীক্ষায় থাকো, আদেশ আসবে।

* * *

গুরগাঁওতে ছিলেন কোম্পানীর ফোর্ড সাহেব। হঠাৎ একদিন তিনি এই চাপাটির গল্প শুনতে পেলেন। যাচাই করে দেখলেন কথাটি সত্যি। চাপাটি এসেছে রুগাঁও শহরে।

ব্যাপারটি কী জানবার জন্যে ফোর্ড সাহেব অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুই জানতে পারলেন না। বাধ্য হয়ে ক'লকাতার কোম্পানীর দপ্তরে এ খবরটা জানালেন। জানালেন দেশে দেশে সেপাইরা চাপাটি পাঠাচ্ছে। কী ব্যাপার ? বিভিন্ন

জায়গায় চাপাটি পাঠিয়েই আহামুত্তুল্লা চুপ করে রইলেন না। তিনি জায়গায় জায়গায় ঘুরতে লাগলেন।

হঠাৎ একদিন কোম্পানী টের পেলেন যে আহামুত্তুল্লা বিপ্লবের বীজ ছড়াচ্ছে। গ্রেপ্তার হলেন আহামুত্তুল্লা আর সেই সঙ্গে হলো ফাঁসীর হুকুম।

রাত পোহালেই আহামুত্তুল্লার ফাঁসী হবে। কিন্তু তার আগেই এসে গেলো বিপ্লব।

আহামুত্তুল্লা পালিয়ে গেলেন।

* * *

এদিকে নানা সাহেব আজিমুল্লা খাঁকে সঙ্গে করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। চক্রান্তের মতলবে নয়—তিনি দেখতে চান যে সর্ব-গ্রাসী ইংরেজ কী করে এদেশকে ছিনিয়ে নিচ্ছে দেশের লোকের কাছ থেকে। এই নিয়ে নানা সাহেব ভাবতে লাগলেন। প্রথমে অন্য কেউ বড়ো উৎসাহই দেখালেন না। তারপর একদিন অযোধ্যা গেলো কোম্পানীর হাতে, নানা সাহেবও সহানুভূতি পেতে লাগলেন চারদিক থেকে।

একদিন আজিমুল্লাকে সঙ্গে নিয়ে নানা সাহেব গেলেন লক্ষ্ণৌতে। তখন সেখানে কোম্পানীর রেসিডেন্ট সাহেব হেনরী লরেন্স। নানা সাহেব তাকে গিয়ে ধরলেন যে তিনি লক্ষ্ণৌ দেখতে এসেছেন।

সাহেব তো খুশী। কর্মচারীদের আদেশ দিলেন নানা

সাহেবকে যেন আদর যত্নের সঙ্গে শহর দেখানো হয়। সেখান থেকে তারা এলেন দিল্লী, তারপর ক'লকাতা।

সাহেবদের মনে বড়ো সন্দেহ নানা সাহেব দেশ-বিদেশ ঘুরছেন কেন? তিনি কি চক্রান্ত ক'রার ফিকিরে আছেন?

ভুল! দেশ জোড়া যে অসন্তোষের আগুণ জ্বলে উঠেছে তার জন্যে কোন চক্রান্তের প্রয়োজন নেই। নানা সাহেব একবার দেখতে চান যে সত্যিই অসন্তোষ বাড়ছে কি না। এই তার মতলব, আর কিছু নয়। এইভাবে উত্তেজনা যখন ক্রমেই বাড়ছে তখন সেপাইদের মধ্যেও এ ব্যাধি ছড়িয়ে পড়লো। তার অবশ্যি একটা ভিন্ন কারণ ছিল।

ক'লকাতার এক মুচী নাবিক একদিন এক ব্রাহ্মণ সেপাইকে অনুরোধ করলে তাকে একটু খাবার জল দিতে। তার বড্ডো তেষ্টা পেয়েছে।

তো আমি কী করবো। জল তেষ্টা পেয়েছে তো জল খেয়ে নাও। ব্রাহ্মণ সেপাই জবাব দেয়।

ঐ তোমার ঘটী থেকে একটু জল দাওনা—মুচী বলে।

পাগল আর কি? চামারকে জল দিই আর আমার জাত খোয়াই—সেপাই জবাব দিলে।

বেশ, জল দিলে না তো বয়েই গেলো। কিন্তু আজ বাদে কাল যখন তোমার ঐ দাঁত দিয়ে চর্বিওয়ালা গুলী কাটবে তখন তোমার জাত থাকবে কোথায় শুনি—নাবিক উত্তর দেয়।

কী বললে, চর্বিওয়ালা গুলী কাটতে হবে?

ঠিকই বলেছি বাপু। মজাটা দেখবে'খন কয়েক দিন বাদে। এই বলে নাবিক চলে গেলো।

চামার নাবিকের কথা সেপাই মহলে ছড়িয়ে পড়লো। আগুনে যেন ঘি পড়লো। দিনের পর দিন সেপাইরা ইংরেজের অবিচারের কথা শুনে এসেছে। অযোধ্যা ইংরেজের হাতে চলে যাবার পর তাদের কতো সেপাই ভাই চাকুরি খুইয়েছে। চোখের সামনে রোজ রোজ দেখতে পাচ্ছে তাদের মালিকদের কী করে কোম্পানী উচ্ছেদ করে দিচ্ছে। ওরা যদি রাজাদেরই এ ভাবে উৎখাত করে দিতে পারে, তা হ'লে তাদের কী অবস্থা হবে। না, এর একটা বিহিত করতে হবে।

* * *

মার্চ মাস।

ক'লকাতায় আছেন নানা সাহেব।

রোজই সাহেবদের ডিনার-পার্টি লাঞ্চ হচ্ছে।

নানা সাহেব হাসেন, সাহেবরাও হাসেন।

আজ শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে মস্তো খানা হবে। ফোর্টের সব সাহেব মেম-সাহেব যাবেন এই খানা খেতে। সাহেবদের মনে বড়ো ভয় জাগে, আচ্ছা সত্যিই কী নানা সাহেবের কোন অভিসন্ধি আছে ?

মেঘ হয়েছে সকাল থেকে। টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। আশ্চর্য ! অকালে বৃষ্টি। নানা সাহেবের মনটা খারাপ হয়ে যায়। তাই সাহেবদের জানিয়ে দিলেন যে আজ

আর পার্টি হবে না। কেল্লার মেজর ছিলেন ক্যাভেনো সাহেব। খানা যে বন্ধ হয়ে গেছে এ খবরটা কিন্তু তিনি জানতে পারেন নি। তিনি বোটানিক্যাল গার্ডেনে যাবার জন্য রওনা হলেন। গঙ্গার ঘাটে এসে জানতে পারলেন যে বৃষ্টির জন্যে আজকের পার্টি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তিনি কেল্লায় ফিরে এলেন। ক্যাভেনো সাহেবকে ফিরে আসতে দেখে কেল্লার কেউ কেউ কিন্তু অবাক হলেন।

কী ব্যাপার! তা হ'লে কী কোন গোল বাধলো! এবার থেকে ক'লকাতার সাহেবরা একটু সতর্ক হলেন। না একটু সাবধান হ'তে হবে, নইলে কী ঘটে বলাতো যায় না।

সময় বয়ে যায়। আগুণের স্ফুলিংঙ্গ দু-একবার জ্বলে ওঠে কিন্তু আবার নিভে যায়। কিন্তু নিরাশ হননা জীন্নত মহল, নানাসাহেব, আজিমুল্লা খাঁ ও ঝাঁসীর রাণী।

বিচার চাই, বিচার চাই, আবেদনে না হয় জোর করে নিতে হবে তাদের দাবি।

আট

বহু বহু বছর আগে লণ্ডন শহরে কয়েকজন সাহেব ব্যবসায়ী ঠিক করলেন যে, ওলন্দাজ ও পর্তুগীজদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ব্যবসা করতে হবে। সেই মতলব নিয়ে তারা একটা কোম্পানী খুললেন। নাম দিলেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী।

ব্রিটিশ রাজদরবারে আবেদন গেলো। ওলন্দাজ ও পর্তুগীজদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ব্যবসা করবো। হুকুম দাও। মহারাণীর অনুমতি মিললো।

ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিরা এলেন হিন্দুস্থানে। সুরাট বন্দরে তাদের পড়লো ছাউনী।

এমনি করে বছরের পর বছর গেলো। তারপর সুরাট থেকে কলকাতা, ছাউনী থেকে হলো ফোর্ট উইলিয়াম।

সাহেবদের কিন্তু দুর্গম সাধনা। বাধা বিপত্তি লাঞ্ছনা পেয়েও তারা দমে গেলেন না।

তখনও চলছে মুঘল সম্রাটের আমল। সম্রাটের চাইতে তার কর্মচারীদের দাপট বেশী। তাদের অত্যাচারে সাহেবদের অতিষ্ঠ হতে হলো সত্য কিন্তু ব্যবসায়ীর জাত, মাটি আঁকড়ে তারা পড়ে রইলেন।

কিছুদিন বাদে দিল্লীর সম্রাটেরা হয়ে পড়লেন দুর্বল। তাদের হুংকার হলো বন্ধ। আকবর নেই, জাহাঙ্গীর নেই—আউরঙ্গজেব

মারা গেছেন। সিংহাসনে যারা বসে আছেন তাদের নেই মেরুদণ্ড। কোম্পানীর সাহেবরা বুঝতে পারলেন যে এই হলো তাদের ভিত্তি গাড়বার সময়। বললেন ব্যবসাও করবো, বাদশাও হবো।

হলোও তাই।

ইংরেজের ক্ষমতা দিন দিম বাড়তে লাগলো। ছোট গ্রাম থেকে পরগনা, পরগনা থেকে জেলা, এক এক করে সবই তারা দখল করে নিলেন।

পলাশীর আম বাগানে ভারতের ভাগ্য বদলে গেলো। ক্লাইভের চেষ্টায় সর্ব প্রথম উড়লো ইংরেজের পতাকা—ইউনিয়ন জ্যাক। খুশী হয়ে সাহেবরা গাইতে লাগলেন 'গড সেভ দি কুইন।'

ক্লাইভ গেলেন। এলেন হেষ্টিংস এ দেশে কোম্পানীর বড়ো সাহেব হয়ে। এর পরে কতো অদল বদল হলো তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

শেষে এলেন লর্ড ডালহাউসী। ডালহাউসী এসেই বুঝতে পারলেন যে আইনত এখনও—তারা মুঘল সম্রাটের জায়গীরদার। তিনি ভাবেন, না এ অপমান আর সহ্য করা যায় না। কিসের প্রজা, কিসের জায়গীরদার। সম্রাটেরও যা ক্ষমতা কোম্পানীরও তাই। তাই তিনি প্রথমে প্রজার নিশানা সম্রাটকে 'নজর' দেওয়া বন্ধ করলেন। এর পরে কালি-কলম নিয়ে বসলেন। লিখলেন লক্ষ্ণৌ নাগপুর……

ঝাঁসী……

চারিদিকে উড়তে লাগলো ইউনিয়ন জ্যাক। সাহেবদের

খুশী বাড়ে। মনের আনন্দে খানা খান আর গান 'গড সেভ দি কুইন।'

*　　　*　　　*

সাহেবরা যখন আনন্দ উৎসবে মত্ত, তখন হিন্দুস্থানের প্রতি ঘরে-ঘরে উঠেছে হতাশার চিহ্ন। এর পরে কী হবে? সবাই ভাবেন। আর এদিকে চড়কি বাজীর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন আজিমুল্লা, নানাসাহেব। লালকেল্লায় ছোট বেগম জীন্নত মহল প্রতীক্ষায় আছেন কবে উঠবে তুফান। আর হিন্দুস্থানের প্রতি ঘরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে একটি কথা 'মেরী ঝাঁসী নহী দুঙ্গী'।

*　　　*　　　*

এর কিছু আগে।........

পয়লা আগস্ট, ১৮৫৫ খৃঃ লণ্ডন শহরে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দপ্তরে আজ একটা বড়ো খানা হচ্ছে। গণ্যমান্য অতিথিরা এসেছেন। উপলক্ষ হিন্দুস্থানে কোম্পানীর বড়ো সাহেব হ'য়ে ক্যানিং যাচ্ছেন। বিদায় নিচ্ছেন লর্ড ডালহাউসী।

কোম্পানীর সভাপতি এলিয়ট ম্যাকটন খানার টেবিলে ক্যানিংএর পরিচয় করিয়ে দিলেন অতিথিদের সঙ্গে।

এবার ক্যানিংকে কিছু বলতে হবে। কী বলবেন তিনি। সবাই জানে ক্যানিং বলতে পারেন না। তবু তিনি বললেন কয়েকটি কথা।

তার মধ্যে একটি কথা যে এমনি ভাবে ভবিষ্যতে ফলে যাবে

তা কে জানতো। সে কথা ছিল সতর্কবাণী, কোম্পানীর ডিরেক্টরদের প্রতি।

'ঐ হিন্দুস্থানের আকাশে আমি দেখতে পাচ্ছি এক টুকরা মেঘ—' ক্যানিং বললেন। 'ছোট মেঘ, সামান্য হাতের মুঠোর মতো। কিন্তু ঐ ছোট মেঘই একদিন হয়ে উঠবে বড়ো। সমস্ত হিন্দুস্থান হয়তো ছেয়ে ফেলবে। উঠবে কাল বৈশাখী, উঠবে তুফান।'

মিথ্যে অনুমান করেন নি ক্যানিং।

কারণ সত্যিই একদিন হিন্দুস্থানে তুফান এলো। এরই আভাস পেয়েছিলেন লালকেল্লা থেকে জীন্নত মহল, গার্ডেন রীচ থেকে নবাব ওয়াজিদ আলী শা, কোম্পানীর বড়ো দপ্তর থেকে লর্ড ক্যানিং।

সেই কাল বৈশাখী একদিন এলো বাংলাদেশের ব্যারাকপুরে।

* * *

রবিবার, মার্চ মাস।

ব্যারাকপুরে সৈন্য বাহিনীর মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

হাতিয়ার নিয়েছে বীর সৈনিক মঙ্গল পাণ্ডে। তাই সোরগোল উঠেছে সেপাই মহলে।'

'হাতিয়ার নাও তোমরা সবাই-—' মঙ্গলপাণ্ডে চেঁচিয়ে বলে :

সবাই তো অবাক। পাণ্ডে বলে কী।

লোকটার কি মাথা খারাপ হলো। কোম্পানীর বিরুদ্ধে হাতিয়ার !

পাণ্ডের চীৎকার শুনে বাউগ বলে এক গোরা সাহেব বেরিয়ে এলেন বীর দর্পে। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে পাণ্ডে তাকে কাবু করে ফেললো।

সেপাইরা নির্বাক নিশ্চল। একজন গোরা সাহেবকে পাণ্ডে যে এমনি ভাবে কাবু করতে পারবে এ তারা কল্পনা করেনি। এর মধ্যে বাউগকে সাহায্য করতে আর এক গোরা সাহেব এগিয়ে এলেন। কিন্তু তিনিও হলেন কাবু।

অসম্ভব কাণ্ড আর কি! সেপাইরা বিশ্বাসই করতে চায় না যে পাণ্ডে এমনি সাহস দেখাতে পারে।

কাতরভাবে সাহেবরা সেপাইদের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। কিন্তু কেউ এগিয়ে এলো না—শুধু এলো শেখ পলটু বলে এক সেপাই। সেই বাধা দিলে মঙ্গল পাণ্ডেকে।

মঙ্গলপাণ্ডের কীর্তি এর মধ্যে জেনারেল হেয়ারসের কাছে পৌঁছে গেছে। খবরটা শুনে তো তিনি অবাক। এ্যাদ্দুর সাহস মঙ্গলপাণ্ডের। দিশী হয়ে সাহেবদের গায়ে হাত দেয়। তিনি রাগে জ্বলতে লাগলেন। তুই ছেলেকে সঙ্গে করে জেনারেল সাহেব নিজেই চলে এলেন ব্যাপারটা কী দেখতে। সেই সঙ্গে সঙ্গে আরো কয়েকজন কর্মচারী এলেন হেয়ারসের সঙ্গে।

বন্দুকে গুলী ভরা মঙ্গলপাণ্ডের। তাক করেছে নিশানা। হেয়ারসের তুই ছেলে চেঁচিয়ে উঠলো—সাবধান বাবা। মঙ্গল গুলী চালাচ্ছে তোমায় লক্ষ্য করে।

কিন্তু মিথ্যে এ অনুমান। মঙ্গলপাণ্ডে জেনারেল হেয়ারসকে

গুলী করলে না। পা দিয়ে ট্রিগার চেপে মঙ্গলপাণ্ডে নিজেকেই গুলী করলো। আত্মহত্যা।

তার তাজা রক্তে রাঙা হয়ে উঠলো ব্যারাকপুরের মাটি।

সিপাহী বিপ্লবের জন্যে প্রথম রক্ত দিলে ভারতের সন্তান মঙ্গল পাণ্ডে।

* * *

মারা গেলো না মঙ্গল পাণ্ডে।

আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। তারপর চিকিৎসা, বিচার। সেই বিচারে মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসীর হুকুম হলো। সাহেবরা চেষ্টা করলেন মঙ্গল পাণ্ডের কাছ থেকে কথা বের করে নিতে। কিন্তু একটি কথাও বের করতে পারলে না।

সাহেবরা বুঝতে পারলেন যে ব্যাপারটা অনেকদূর এগিয়েছে। আন্দোলনের আগুণ জ্বলছে সমস্ত দেশ জুড়ে।

বুঝতে পারলেন যে হয় তাদের এই আগুণ নেভাতে হবে, নয় তো এর মধ্যেই পুড়তে হবে।

কী করবেন—সাহেবরা ভাবেন।

* * *

মীরাট শহর, মে মাস।

সেপাই ছাউনীতে পৌছে গেছে মঙ্গল পাণ্ডের বীরত্বের কথা

এমন সময় একদিন সাহেবরা হুকুম দিলেন যে সেপাইদের প্যারেড হবে। ব্যাপারটা পরখ করে দেখতে চান তারা যে নতুন কার্তুজ সেপাইরা নেবে কিনা। তা হলেই বোঝা যাবে তাদের অনুমান কতোদূর সত্যি। ব্যাপারটার গুরুত্ব পরখ করে দেখা যাবে।

প্যারেড হলো। সেপাইদের মধ্যে একদল নতুন কার্তুজ নিতে অস্বীকার করলে। সেই কলকাতার নাবিক ও সেপাইর কাহিনী তারাও শুনেছিল। অতএব তারা স্পষ্ট বলে দিলে এই চর্বিওয়ালা কার্তুজ নেবে না। সাহেবরা বলেন এ কার্তুজে চর্বি নেই। কিন্তু সেপাইরা এ কথা মানতে রাজী নয়।

পরদিন আবার প্যারেড হলো। যারা নতুন কার্তুজ নিতে অস্বীকার করেছিল, তাদের সৈন্যবাহিনী থেকে তাড়িয়ে দেয়া হবে, এ হলো কোম্পানীর আদেশ। প্যারেডে আস্তে-আস্তে সেপাইদের পোশাক তাদের গা থেকে খুলে নেয়া হলো। তাদের পায়ে দেয়া হলো শেকল, হাতে পড়লো দড়ি।

বন্দী সেপাইদের সহকর্ম্মীরা কিন্তু এ দৃশ্য দেখে হতবাক। কোম্পানী যে এইভাবে তাদের সহকর্মীদের সঙ্গে ব্যবহার করবে এ তারা কল্পনাও করেনি। কী ক'রবে তারা। এ অপমান সহ্য করবে, না প্রতিশোধ নেবে।

*　　　*　　　*

তারপর একদিন রোববারে।

সাহেবরা গিয়েছেন গির্জায়। বাড়ি খালি, বাড়ির চাকরেরাও ছুটি নিয়েছে। সমস্ত শহর থম-থম করছে।

একটু পরে সমস্ত মীরাট সেপাইদের কলরবে মুখরিত হয়ে উঠলো।

আকাশ-বাতাসে শোনা গেলো শুধু এক ধ্বনি—দীন-দীন-দীন।

সুরু হয়ে গেছে বিপ্লব। হাতিয়ার নিয়েছে সবাই বিদেশীর বিরুদ্ধে।

*   *   *

অবাক কাণ্ড!

এই আন্দোলনের নেতা হলেন এক ইউরোপীয়ান। তিনি ছিলেন একজন গোরা সৈন্য। কিছুদিন আগে—তাঁর সাহেবদের সঙ্গে ঝগড়া হয়। সৈন্যবাহিনী ছেড়ে দেন আর হয়ে যান মুসলমান। তিনিই আজ—তাঁর দেশবাসীদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার নিলেন।

মুহূর্তের মধ্যে মীরাট দখল করে নিলে সেপাইরা। বন্দী সেপাই ভাইদের দিলে তারা মুক্তি।

তারপর সবাই চীৎকার করে বললে ঃ

দিল্লী চলো............চলো লাল কেল্লায়।

*   *   *

নয়

পাহাড়গঞ্জ থানার দারোগা মৈনুদ্দিন মিঞা সাহেব। ভোর-বেলা থানায় বসে তার কর্মচারীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন।

এমনি সময়ে একটি গোলমাল শুনতে পেলেন।

ওকে! আরে এ যে দেখছি কোম্পানীর থিয়োকেলাস মেটকাফ সাহেব। এই ভোরবেলা সাহেব এসেছেন কী করতে। আর এ কী পোশাক! পরনে শুধু হাফ প্যাণ্ট, গায়ে গেঞ্জি। চুলগুলো এলোমেলো। চোখ দুটো টক্‌টকে লাল।

কী ব্যাপার সাহেব—প্রশ্ন করে মৈনুদ্দিন।

বিদ্রোহ সুরু হয়ে গেছে মৈনুদ্দিন, মীরাট থেকে বিদ্রোহী সেনারা এসে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে সব। চারদিকে গোলমাল। সাহেব দেখলেই হলো, তারা কোতল করছে। কোন রকমে নিজের প্রাণটা বাঁচিয়ে এসেছি। আমায় আশ্রয় দিতে পারো মৈনুদ্দিন।

সাহেবের কাতর কণ্ঠ!

হয়ত সেপাইরা এতোক্ষণে লাল কেল্লায় পৌঁছে গেছে, সাহেব বলতে থাকেন।

মৈনুদ্দিন চুপ করে রইল। সেপাইরা বিদ্রোহ করেছে এ যেন তার বিশ্বাস হয় না। কয়েকদিন ধরেই বাজারে এ

রকম গুজব রটেছিল বটে, কিন্তু সত্যিই যে গোলমাল হবে এটা মৈনুদ্দিন কল্পনা করেনি।

আমায় আশ্রয় দেবে মৈনুদ্দিন—সাহেবের কাতর কণ্ঠে মৈনুদ্দিনের তন্দ্রা ভাঙ্গে। কিন্তু কোথায় সাহেবকে লুকিয়ে রাখা যায় মৈনুদ্দিন ভাবে। গোলমাল যদি সত্যিই বেধে থাকে তা হলে চারদিকেই বিপদ। নিজের বাড়িতে রাখবেন সাহেবকে। সেই ভালো মৈনুদ্দিন ভাবলে।

সাহেব চলুন আমার বাড়িতে—মৈনুদ্দিন বলে।

না, না মৈনুদ্দিন আমি তোমার জীবন বিপন্ন করতে চাইনে। আমায় বন্দোবস্ত করে দাও যাতে আম এ জায়গা ছেড়ে চলে যেতে পারি—মেটকাফ সাহেব উত্তর দেন।

বেশ চলুন তাহ'লে আমার এক বিশ্বস্ত চৌকিদারের কাছে।

চলো। কিন্তু তার আগে আমায় একবার নিজের বাড়িতে যেতে হবে। সিন্দুকে বেশ কিছু টাকা রেখে এসেছি। ওগুলো না নিয়ে এলে বিদ্রোহীরা নিয়ে যাবে।

আপনি পাগল হয়েছেন সাহেব। এ গোলমালে নিজের বাড়িতে ফিরে যাবেন। কক্ষনো নয়। চলুন, আমার সঙ্গে।

একরকম জোর করেই মৈনুদ্দিন মেটকাফ সাহেবকে তার এক বিশ্বস্ত চৌকিদারের বাড়িতে নিয়ে গেলো। সেখানে তার জিম্মায় রেখে সে গেলো চাঁদনী চকে। দেখবে ব্যাপারটা কী। কিন্তু সেখানে গিয়ে যে দৃশ্য দেখতে পেলো তা সে কখনই ভোলেনি। পথ-ঘাট কোর্ট সবই দখল ক'রে নিয়েছে সেপাইরা।

সারা শহরে শুধু শোনা যায় এক ধ্বনি—দীন, দীন, দীন...

*　　　　*　　　　*

বিপ্লবী সেপাইরা দিল্লী আসছে এ খবরটা কোম্পানীর কমিশনার ফ্রেজার সাহেব আগেই পেয়েছিলেন। আগের দিন রাত্রেই মীরাট থেকে ডগলাস বলে এক সাহেব এক চিঠি লিখে জানিয়ে ছিলেন যে সেপাইরা যাচ্ছে। তৈরী হও। চিঠিটা নিয়ে এলো এক আর্দালী।

কিসের চিঠি—ঘুমের ব্যাঘাত হওয়াতে ফ্রেজার সাহেবের মেজাজ রুক্ষ হয়ে যায়। আর্দালী চিঠি দিলে কিন্তু সাহেব সে চিঠি খুলেও পড়লেন না।

যখন তার পড়বার সময় হলো তখন বিপ্লবীর দল দিল্লীপ্রান্তে এসে গেছে।

*　　　　*　　　　*

লালকেল্লায় জনতার কোলাহলে সম্রাট বাহাদুর শা'র তন্দ্রা ভাঙ্গলো।

ও কী ব্যাপার? প্রশ্ন করেন সম্রাট।

মীরাট থেকে বিপ্লবী সেপাইরা এসেছে। তারা বাদশাহের দর্শন চায়।—একজন বললে।

আমার! একটু বিস্মিত হয়েই সম্রাট জিজ্ঞেস করেন। কণ্ঠে আছে তাঁর ব্যাকুলতার সুর।

হ্যাঁ সম্রাট। তারা বলে ইংরেজের বিরুদ্ধে হাতিয়ার

নিয়েছে। আপনি হলেন দিল্লীর বাদশাহ। এ বিপ্লবের নেতা আপনাকেই তারা করবে বলছে।

আরো বিস্ময়! তিনি কবি মানুষ—প্রকৃতির সৌন্দর্য তাঁর মনে দাগ কাটে সত্য, কিন্তু তরবারীর ধার তাঁর মনে রেখাপাত করে না।

সত্যিই কি বিপ্লব সুরু হলো। বেগম জীন্নতমহল বলেছিল বটে তুফান আসছে। এই কি সেই তুফান। তিনি কি যাবেন সেপাইদের কাছে।

সম্রাটের হেকিম আসানুল্লা খাঁ। জাতে ক্রীশ্চান। তিনি বাধা দিলেন, বললেনঃ সম্রাট আমি বলছিলুম কি কেল্লার পাহারা-দার ডগলাস সাহেবকে ডাকলে হয় না? এই জনতাকে চলে যেতে বলুক ডগলাস।

বেশ তাই হোক—সম্রাট জবাব দেন।

ডাক পড়লো ডগলাসের।

ডগলাস সাহেব এলেন।

এরা কী চায়, ডগলাস—সম্রাট প্রশ্ন করেন।

আপনার দর্শনপ্রার্থী। মীরাট থেকে এসেছে।

তুমি ওদের যেতে বলে দাও ডগলাস।

বেশ আমি যাচ্ছি ওদের কাছে—

আরে না না পাগল হলে নাকি। ওদের কাছে গিয়ে লাভ নেই। বরং এইখান থেকেই বলে দাও ওদের চলে যেতে।

সম্রাটের আদেশানুযায়ী সেপাইদের ডগলাস সম্রাটের অভিপ্রায় জানালেন।

কিন্তু কে কার কথা শোনে। সমস্ত দিল্লী শহরে তখন তাণ্ডব নৃত্য চলছে। একটু বাদে সেই তাণ্ডবলীলায় প্রাণ দিলেন ডগলাস, ফ্রেজারের দল। উত্তেজনায় লালকেল্লা গম-গম করতে লাগলো।

*　　　*　　　*

সেপাইদের কাণ্ডকারখানা দেখে সম্রাট কিন্তু প্রথমটায় ভড়কে গিয়েছিলেন। বন্ধু পরামর্শদাতা হেকিম আসানুল্লা খাঁকে ডেকে বললেনঃ কি করি হেকিম। আমি বুড়ো মানুষ। ইংরেজরা আমায় অপমান করেছে। তাই ভেবেছিলুম জীবনের ক'টা দিন কুতুব সাহেবের দরগায় গিয়ে কাটাব। কিন্তু এদিকে বিষম বিপদ।

একথা শুনতে পেলেন জীন্নতমহল, মির্জা মুঘল।

জীন্নতমহল বলেন, জাঁহাপনা ভুলবেন না যে আপনি প্রবল পরাক্রমশালী আওরেঙ্গজেবের বংশধর। আপনার পূর্বপুরুষেরা দিনের পর দিন যুদ্ধ করে কাটিয়েছেন। আজ এসেছে আপনার দিন। আপনি পেছপা হবেন না। ইংরেজের সাথে শক্তি পরীক্ষা করুন। শাহাজাদা মির্জা মুঘল সায় দেন। তারও ঐ কথা।

সম্রাট, ফিরিঙ্গীর হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে সুরু হয়েছে এই আন্দোলন। আপনি হলেন দিল্লীর সম্রাট বাহাদুর শা। এ আন্দোলনের নেতা। আপনি নেতৃত্ব নিতে অস্বীকার করবেন না।

স্ত্রী-র কথা, ছেলের কথা ফেলতে পারলেন না সম্রাট। এরা ঠিকই বলেছে যে ফিরিঙ্গীর হাত থেকে মুক্তি পাবার এই হলো

সংগ্রাম। তিনি নিজে বিদেশীর হাত থেকে মুক্ত ভারতের সম্রাট হতে চান না। তিনি শুধু দেখতে চান বিদেশী শক্তি চিরদিনের জন্যে এদেশ থেকে বিদায় নিয়েছে। বাইরে তখনও সেপাইর দল কলরব করছে। সম্রাট গিয়ে তাদের সামনে দাড়ালেন। গগনভেদী উঠলো সেপাইদের চীৎকার; শাহান শা, আবুল মুজাফর মুহম্মদ বাহাদুর শা বাদশাহ-ই-গাজী জিন্দাবাদ।

সেদিনই সম্রাটকে নিয়ে সেপাইর দল শহরে বেরুল। হাতীতে চড়ে যান সম্রাট। চারদিক থেকে ওঠে হর্ষধ্বনি।

এই বিপ্লবের নেতা হয়েছেন দিল্লীর সম্রাট। আর কিসের ভয়!

* * *

এই বিপ্লব সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর সাহেবরা আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। ব্যাপারটা আর কিছু নয়, যদি বারুদখানা সেপাইদের হাতে পড়ে যায় তাহ'লেই মুস্কিল। কী করা যায় সাহেবরা ভাবেন।

ঠিক হলো যদি প্রয়োজন হয় তা হ'লে বারুদখানা উড়িয়ে দিতে হবে।

এই বারুদখানার ভার ছিল জেনারেল উইলোবীর হাতে।

সেপাইরা এসে তাকে বললে, আত্মসমর্পণ করো নইলে জোর করে বারুদখানা ছিনিয়ে নেবো। সম্রাট বাহাদুর শা হুকুম দিয়েছেন।

উইলোবী কোন জবাব দিলেন না!

সুরু হয়ে গেলো লড়াই।

বারুদখানায় আছেন আটজন গোরা সৈন্য। দুজনের হাতে

দেশলাই। প্রয়োজন হলে আগুন জ্বালিয়ে দিতে হবে। ধ্বংস করতে হবে বারুদখানা।

বেশ খানিকক্ষণ লড়াই হবার পর সেপাইরা যখন গোরা সৈন্যদের কাবু করে এনেছে তখন হঠাৎ বারুদখানায় আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হলো। ব্যস, আর কথা নেই। এক প্রচণ্ড শব্দ হলো। উড়ে গেলো বারুদখানা।

ইংরেজরা জীবন দিলেন কিন্তু বারুদখানা দিলেন না।

* * *

দিল্লীর সেপাইরা এসে মির্জা মুঘলকে এই বিপ্লবের প্রধান সেনাপতি করলেন। তার সঙ্গে রইলেন আরো কয়েকজন রাজকুমার, মির্জা আবুবকর, মির্জা খিজির সুলতান, মির্জা আবদুল্লা।

রোজই লালকেল্লায় দরবার বসে। সম্রাট আর্জি শোনেন। সেপাইরা আসে মাঝে মাঝে। জানিয়ে যায় লড়াইর হালচাল।

হঠাৎ একদিন সম্রাটের কানে খবর গেলো যে একদল মুসলমান চেষ্টা করছে জেহাদের পতাকা উড়াতে জুম্মা মসজিদে।

খবর পেয়েই সম্রাট তাদের ধমকে দিলেন। বললেন, তোমরা পাগল হয়েছো! এমন কিছু করবেনা যাতে হিন্দু ভাইদের মনে আঘাত লাগে। যদি এ আন্দোলন জেহাদ হয়, তাহলে মনে করো এ জেহাদ হলো ইংরেজের বিরুদ্ধে। হিন্দুর বিরুদ্ধে নয়।

ধমক শুনে জেহাদের পতাকা নামিয়ে ফেলা হলো।

বিপ্লব সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে বিভীষণ বাহিনীও তৎপর হয়ে উঠলো। নানাভাবে তারা সেপাইদের বাধা বিপত্তি ঘটাতে লাগলো।

* * *

দশ

এমনি করে কাটে প্রহরের পর প্রহর—দিনের পর দিন। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে শহর থেকে গ্রামে। কিন্তু দিল্লীই হলো সবচাইতে বড়ো ঘাঁটি।

কোম্পানীর জন লরেন্স সাহেব স্পষ্ট বলে দিলেন, দিল্লীর উপর নির্ভর করছে সমস্ত কোম্পানীর ভাগ্য। যদি দিল্লীর যুদ্ধে জিতি, তাহ'লে হিন্দুস্থান হবে আমাদের। অতএব দুপক্ষই দিল্লীর সংগ্রাম নিয়ে মেতে রইলেন।

*　　*　　*

এগারো

তেইশে, জুন ১৮৫৭। আজ পলাশীর যুদ্ধের শত বার্ষিকী। এমনি দিনে ক্লাইভের কাছে হার স্বীকার করেছিলেন সিরাজউদ্দৌলা। আজ তার প্রতিশোধ নিতে হবে। এ হলো সেপাইদের দৃঢ় পণ। জলন্ধর থেকে একদল নতুন সেপাই এসেছে। তাই দলটা একটু ভারী হয়েছে; অতএব আজকের রাতেই যে আক্রমণের সব চাইতে সেরা সময় এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

প্রবল জোরে সেপাইরা ইংরেজদের ঘাঁটি 'বড়া হিন্দুরাও' আক্রমণ করলে। দুপক্ষই মরীয়া সংগ্রাম করছে তখন হঠাৎ খবর এলো ইংরেজদের নতুন সৈন্যদল আসছে। খবরটা পেয়ে সেপাইদের উৎসাহ অনেক কমে গেলো।

আক্রমণ হলো ব্যর্থ।

* * *

তারপর রোজই আক্রমণ চলে।

নতুন করে আক্রমণ করার জন্যে সম্রাট তলব করলেন মুহম্মদ বখৎ খাঁকে।

নামজাদা সৈন্য বখৎ খান। প্রধান সেনাপতি তাকেই করা হলো। সেই সঙ্গে সঙ্গে উপাধি দেয়া হলো শহব-ই-আলম বাহাদুর।

সেই সঙ্গে তৈরী হলো এক নতুন কমিটি। তাদের কাজ হলো যুদ্ধ চালানো ও সরকারী কাজ তদারক করা।

সেপাইদের মাইনে দেয়া নিয়ে হলো আর এক সমস্যা। শহরের ধনী ব্যবসাদারদের তলব হলো। বলা হোল—পয়সা দাও, নইলে লড়াই চালাতে পারছিনে।

সম্রাটের আদেশ সেপাইদের মাইনে দিতেই হবে। অতএব ব্যবসাদারদের মুখটা চুন হয়ে গেলো। টাকা না দিয়ে উপায় নেই। কী করেন আর। দিতে হলো বেশ মোটা রকমের চাঁদা।

* * *

দোকান লুট, রাহাজানি কিংবা চুরি যে করবে তার শাস্তি প্রাণদণ্ড—

ঢেঁঢরা পিটিয়ে সম্রাট দিল্লীবাসীকে সতর্ক করে দিলেন। কাউকে রেহাই দে'য়া হবে না।

রোজই সম্রাটের কাছে নালিশ আসে লুটতরাজ বাড়ছে। শুধু তাই নয়, রাজপরিবারের লোকেরাও এই লুটতরাজ করাচ্ছেন, এ অভিযোগ হলো।

এই অত্যাচার আমি কিছুতেই সহ্য করবো না—স্পষ্ট ভাষায় সম্রাট জানালেন।

কিন্তু রাজপরিবারের কেউ যদি লুটতরাজ করে, তবে তার কী শাস্তি হবে ?—প্রশ্ন করেন বখৎ খাঁ।

প্রাণদণ্ড! কাউকে বাদ দেয়া হ'বে না।

তাই হলো। লুট করতে গিয়ে যারা ধরা পড়লেন সেপাইদের কাছে তাদের প্রাণ দিতে হলো।

* * *

বেশ কয়েকদিন লড়াই-র পর ইংরেজ যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তখন লড়াই-র মধ্যে এক আলোড়নের সৃষ্টি করলেন এক ইংরেজ ক্যাপ্টেন। নাম তার জন নিকলসন।

পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইভ বাঁচিয়েছিলেন কোম্পানীকে, দিল্লীর যুদ্ধে ইংরেজকে রক্ষা করলেন জন নিকলসন।

* * *

জন নিকলসন···জন নিকলসন···জন নিকলসন। সাহেব পাড়ায় বিত্যুৎগতিতে এই নামটি ছড়িয়ে পড়লো।

গোরা সৈন্যেরা যেন প্রাণ পেলে। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন লর্ড ক্যানিং। বুড়ো সাহেব মেমসাহেবের দল বললেন, নিকলসন, যাক এ যাত্রা রক্ষা পাওয়া গেলো।

কে এই নিকলসন। কার অমন খ্যাতি, যার কথায় আহত সৈন্য বিছানা ছেড়ে ওঠে, ছেলে-বুড়োর দল এগিয়ে আসে, কোম্পানীর কর্তারা নিশ্চিন্ত হন।

কী তার পরিচয়?

১৮২৫ খৃঃ আয়ার্লণ্ডের ডাবলীন শহরের এক বাড়িতে।

একটি তিন বছরের ছেলে ঘরে বসে পাঁয়তারা কষছে। বার-বার ছুটে যাচ্ছে ঘুষি বাগিয়ে দেয়ালের দিকে।

এমনি সময় তার মা এসে উপস্থিত। বললেন ঃ ও কীরে পাগলা কর্চ্ছিস কি ?

শয়তানকে তাড়াচ্ছি মা। দ্যাখোনা আমায় পেয়ে বসেছিল আর কি।

ছোট ঘটনা, তবু মনে রাখবার মতো। কারণ এই ঘটনা

থেকেই শিশুর মনের পরিচয় পাওয়া যাবে।

এর কিছুদিন বাদে ছেলেটির বাবা মারা গেলেন। মা একাই সংসার চালান। তিনি স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল দপ্তরে 'হেলথ ভিজিটরের' কাজ নিলেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে লোক দেখে আসা এই তার কাজ।

রোজই মা তার কোন এক ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বেরোন। একদিন তিনি তার শয়তান-তাড়ানো ছেলেকে সঙ্গে নিলেন।

সব বাড়িতে মা গেলেন শুধু একটি বাড়ি তিনি এড়িয়ে গেলেন। ছেলে তার মা'কে জিজ্ঞেস করলেঃ সে কী মা, এ বাড়িতে গেলে না কেন ?

এই বাড়ির লোকগুলো বডডো খারাপ। আমি এদের কাছে কখনও যাইনে।

মার জবাব শুনে ছেলেটি কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে ঃ মা, ভগবান পৃথিবীতে আলো দিয়েছেন খারাপ ভালো দুই শ্রেণীর লোকের জন্যেই। ঈশ্বরের দয়ায় আমরা সবাই বৃষ্টি পাই। যারা ভালো তারাও পায়, যারা মন্দো তারাও পায়। ভগবান যখন ভালো-মন্দের মধ্যে বিভেদ করেননি, তা-হলে তুমি কেন করবে।

ছেলের কথা শুনে মা অবাক হয়ে গেলেন। এই অল্প বয়সের শিশু যে এমনি কথা বলতে পারে এ কিন্তু তিনি কল্পনাও করেননি। তার কথা শুনে তিনি লজ্জা পেলেন।

সেদিন এই বালকের কথা শুনে তার মা চমকে গিয়েছিলেন। ১৮৫৭ খৃঃ এই বালকের বীরত্ব দেখে হয়েছিলেন সবাই মুগ্ধ।

এই বালকের নামই জন নিকলসন।

* * *

বহু ইংরেজ এ দেশে এসে স্মরণীয় হয়ে গেছেন। জন নিকলসন তার অন্যতম।

দোষ যে তার নেই এমন নয়। তিনি বদমেজাজী, মতের মিল না হলে বরদাস্ত করতে পারতেন না আর পারতেন না সমালোচনা সহ্য করতে। কিন্তু তার এমনি গুণ ছিল যা তার সমস্ত দোষকে ছাপিয়ে গেছে।

'নিকলসেন'—এ দেশের লোকেরা তাকে আদর করে ডাকতো। দিল্লীর আসে-পাশে আজো 'নিকলসেন জাতি' বলে এক সম্প্রদায় আছে। এই 'নিকলসেন জাতির' পূর্ব-পুরুষেরা ছিলেন নিকলসনের শিষ্য। নিকলসনের গুণে মুগ্ধ হয়ে নিজেদের নিকলসনের শিষ্য বলে পরিচয় দিতেন তারা। এরা অনেকটা ফকীর শ্রেণীর লোক।

নিকলসন যা ভালো বুঝতেন তাই করতেন। তার অন্তর থেকে যে প্রেরণা আসতো তা তিনি সর্বান্তঃকরণে কাজে লাগাতেন। সেই আদর্শ থেকে কেউ তাকে নড়াতে পারতেন না।

সেপাইদের বিপ্লবের কথা যেদিন প্রথম নিকলসন শুনতে পেলেন সেদিন তিনি বন্ধু এডোয়ার্ডকে লিখলেন ঃ যারা মানুষ খুন করতে পারে তাদের পুড়িয়ে মারা উচিৎ। তুমি অনুমতি দাও, আমি একটা বিল আনবো যাতে দোষীদের কঠোর সাজা দে'য়া হয়।

বন্ধুর স্বভাব এডোয়ার্ডসের জানা ছিল। তিনি নিকলসনের চিঠির জবাব দিলেন না। এর কিছুদিন বাদে নিকলসন এডোয়ার্ডসকে আবার লিখলেন ঃ সেই পুড়িয়ে মারার বিলটির কী করলে?

এডোয়ার্ডস তবু নিরুত্তর।

তারপর সত্যিই একদিন নিকলসন সেপাইদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার সুযোগ পেলেন। তিনি এক যুদ্ধে জয়লাভ করে বহু সেপাই বন্দী করেছেন। ইচ্ছে করলেই সবাইকে আগুনে দিতে পারতেন। কিন্তু তাদের আগুনে দিলেন না বরং মুক্তি দিলেন। বন্ধু এডোয়ার্ডসকে লিখলেন : যুদ্ধে জয়ী হয়েও আমি এদের পুড়িয়ে মারতে পারিনি। আমি এদের মুক্তি দিয়েছি।

এমনি ছিল নিকলসনের স্বভাব। নিকলসন কিন্তু নিজের সহকর্মী গোরা সৈন্যদের মধ্যে একটুও প্রিয় ছিলেন না। তাঁকে কেউ পছন্দ করতেন না তার কারণ নিকলসন নিজের সহকর্মীদের সঙ্গে একদম মেলা-মেশা করতেন না। হয় নিজের কাজ নিয়ে থাকতেন নয় ভাষা শিখতেন। তার মাত্র দুই বন্ধু ছিল—হেনরী লরেন্স, লক্ষ্ণৌর রেসিডেণ্ট সাহেব ও এডোয়ার্ডস, পাঞ্জাবের ডেপুটি কমিশনার। যেদিন দিল্লীর সৈন্য বাহিনীতে খবর এলো যে নিকলসন আসছেন সেদিন অনেকেই হাপ ছাড়লে সত্য কিন্তু মনে মনে তারা সবাই দুঃখিতই হয়েছিলেন। নিকলসন বললেন : জীবনে এমন কিছু নেই যা করা যায় না। অসম্ভব কাজ বলে কিছুই নেই।

এর প্রমাণ তিনি দিলেন দিল্লীর লড়াইতে। ইংরেজের পরাজয় যখন প্রায় ধ্রুব সত্য তখন ইংরেজকে সেই লড়াই তিনি জিতিয়ে দিলেন। এই রকম লোক ছিলেন জন নিকলসন।

* * *

সেপাই বিপ্লবের কাহিনী যখন নিকলসনের কাছে পৌঁছাল তখন তিনি পেশোয়ারে।

পাঞ্জাবে যাতে শান্তি ভঙ্গ না হয় তার জন্যে তিনি উঠে পড়ে লাগলেন।

তারপর একদিন তার ডাক পড়লো দিল্লীতে। নিজের সৈন্যবাহিনী নিয়ে দিল্লীর পানে রওনা হলেন। হুকুম দিলেন রাওয়ালপিণ্ডি ও মারী শহরের গোরা সৈন্যদের তার সঙ্গে যোগ দিতে।

মারী শহর থেকে গোরা সৈন্য সরিয়ে নেয়াতে চীফ্ কমিশনার জন লরেন্স একটু আপত্তি করলেন। অবশ্য, আসল কারণ হলো লরেন্সের স্ত্রী, পুত্র ছিলেন তখন মারী শহরে। অতএব সে দিক থেকে চীফ কমিশনারের আপত্তি হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

নিকলসন চীফ কমিশনারকেও তোয়াক্কা করতেন না তিনি স্পষ্ট বলে দিলেন ঃ সমস্ত সাম্রাজ্যই যখন বিপদের মুখে, তখন সামান্য কয়েকটি মেয়ে ছেলের দিকে নজর দিলে চলবেনা।

সৈন্য বাহিনী নিয়ে নিকলসন দিল্লীতে এলেন।

* * *

এবার ইংরেজ মরীয়া হয়ে উঠলো। সেপাইদের হটাতে হবে এই তাদের পণ।

এদিকে সেপাইদের মধ্যে ভাঙ্গন ধরেছে। নিত্য নতুন দুঃসম্বাদ, অভিযোগ আসছে। পাতিয়ালার মহারাজ যোগ দিয়েছেন ইংরেজের সঙ্গে। সেই সঙ্গে গেছেন নাভার রাজা। সেপাইদের মাইনে দেবার মতো কোষাগারে অর্থ নেই। টাকার জন্যে রোজ সেপাই'রা এসে তাগিদ দিচ্ছে সম্রাটকে।

অবস্থা যখন ক্রমেই সঙ্গীন হয়ে উঠছে তখন নিকলসনের নেতৃত্বে ইংরেজ সেপাইদের আক্রমণ করলে।

সেই যুদ্ধে পরাজয় হলো সেপাইদের। হিন্দুস্থানের ভাগ্য আবার বদলে গেলো।

*   *   *

নিকলসন দিল্লীতে এসেই বুঝলেন যে সেপাইদের সব শক্তি দিয়ে আক্রমণ করতে হবে। আর দেরী নয়।

কিন্তু নিকলসন বললেই আক্রমণ করা যায় না। কারণ দিল্লীর গোরা সৈন্য বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন জেনারেল উইলসন। তিনি দুর্বল প্রকৃতির—সহজেই ভয় পেয়ে যান। দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার অভ্যাস তার নেই।

নিকলসন কিন্তু স্পষ্ট বললেনঃ আক্রমণ করতেই হবে। যদি উইলসন এ আক্রমণের হুকুম না দেয়—তা হলে তাকে বাদ দিয়েই আমরা এ আক্রমণ চালাবো। প্রয়োজন হলে তাকে সেনাপতির পদ থেকে সরিয়ে দিতে হবে।

বন্ধুরা নিকলসনের কথা শুনে হতবাক। লোকটা কি পাগল হলো। প্রধান সেনাপতিকে সরিয়ে দিতে চায়। এ কথা বলাও যে বেআইনী।

উইলসনের আপত্তির একটা কারণ ছিল। গোরা সৈন্যদের মধ্যে টেলর বলে এক ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। খুবই দক্ষ। টেলর বলেছিলেন যে সেপাইদের হটাতে হলে তাদের ঘাঁটি

দখল করতে হবে। আর সেই ঘাঁটি ছিল 'লুডলো ক্যাসেল'। সেই ঘাঁটি আক্রমণ করার একটা প্ল্যান দিলে টেলর। উইলসন বললেন, উহুঁ এতে হবেনা।

প্ল্যানটা দেখতে পেলেন নিকলসন। তিনি দেখেই তো অবাক। বললেন: আলবাৎ হবে। এই প্ল্যান অনুযায়ীই আমরা সেপাইদের আক্রমণ করবো।

উইলসন বলেন: টেলরের প্ল্যান অনুযায়ী আক্রমণ করা সম্ভব নয়। কারণ টেলর যে রাস্তা বাতলেছে ওর অনেক অসুবিধে আছে।

নিকলসন বলেন তিনি নিজে পরখ করে দেখবেন যে এই রাস্তা দিয়ে আক্রমন করলে চলবে কিনা।

সেদিন রাত্রে নিকলসন এক অসম সাহসের কাজ করলেন।

ছদ্মবেশ পরলেন, আর টেলরকে সঙ্গে নিয়ে সোজা চলে এলেন শত্রুর শিবিরে। গোপনে ঘুরে ঘুরে সেপাইদের যুদ্ধের আয়োজন দেখে নিলেন। কেউ সন্দেহ করলেন না যে গোরা সৈন্য এসেছে সেপাইদের শিবিরে। শুধু তাই নয়, নিকলসন সম্রাটের শিবিরেও গেলেন।

ফিরে এসে তিনি উইলসনকে বললেন: আমি নিজের চোখে শত্রুর শিবির দেখে এসেছি। টেলরের প্ল্যান অদ্ভুত। আমাদের সেই প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

নিকলসনের কথা শুনে জেনারেল উইলসন অবাক।

কিন্তু কী করবেন। বাধ্য হয়ে তাকে আক্রমণের হুকুম দিতে হলো।

*　　　　*　　　　*

গোরা সৈন্যরা লড়াইর জন্যে তৈরী হচ্ছে এ খবর সম্রাটও শুনতে পেলেন।

প্রধান সেনাপতি বখৎখানের তলব হলো রাজ দরবারে।

ঃ শুনেছো বোধ হয়। শেষ সংগ্রামের জন্যে ইংরেজ তৈরী হচ্ছে। আমাদের কী অবস্থা?

আমরাও প্রস্তুত।—জবাব দেন বখৎ খান।

*　　　　*　　　　*

তারপর ১৪ই সেপ্টেম্বর।

চারদিক থেকে ইংরেজ সৈন্য আক্রমন করলে সেপাইদের।

এদিকে কামান গর্জে তো ওদিক থেকে বন্দুকের গুলী চলে। সমস্ত জায়গা ছুটোছুটি করে লড়াই চালালেন নিকলসন। যেখানেই বিপদ, সেখানেই নিকলসন। কোন গুলী, কোন বিপদকে তিনি মানলেন না। হঠাৎ এক সেপাই'র গুলী এসে লাগলো নিকলসনের বুকে। রক্তের ফিন্‌কি উঠলো। ডুলি করে নিয়ে যাওয়া হলো তাকে হাসপাতালে। হাসপাতালে নিকলসন শুনতে পেলেন যে জেনারেল উইলসন হটবার মৎলব করছেন।

রুগীর বিছানা থেকে তিনি গর্জে ওঠেন ঃ ফিরে আসবার

হুকুম দিচ্ছে। ঈশ্বর, তুমি আমায় ক্ষমতা দাও আমি যেন ঐ ভীরু উইলসনকে গুলী করে মারতে পারি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইংরেজ যুদ্ধ চালালো। তারপর ছয়দিন লড়াইর বাদে একদিন ইউনিয়ন জ্যাক্ উড়্লো লালকেল্লায়।

যুদ্ধে জয়লাভ করেছে ইংরেজ। হার হয়েছে সেপাইদের।

* * *

বারো

বিপ্লব সুরু হবার ঠিক কিছুদিন আগে একদিন গার্ডেন রীচের বাগানবাড়িতে কোম্পানীর এডমনষ্টোন সাহেব এসে হাজির। হাতে তার পরোয়ানা। বড়ো সাহেব ক্যানিং হুকুম দিয়েছেন নবাব ওয়াজিদ আলী শা-কে গ্রেপ্তার করতে হবে। অপরাধ! লোকে বলে বিপ্লবীদের তিনি নাকি উত্তেজিত করেছেন।

বিশ্বাস নেই নবাবকে, কোম্পানীর সাহেবেরা ভাবেন। উফ, লোকটার যা ইংরেজ বিদ্বেষ। এর চাইতে তাকে কয়েদখানায় পুরে রাখা ভালো। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে নবাবের মন্ত্রী আলী নকী খাঁকে। একই দিনে আলী নকী খাঁ গ্রেপ্তার হলেন।

তারপর নবাব ওয়াজিদ আলী শা। এডমনষ্টোন এসে বললেন ঃ আপনাদের ঠাঁই হয়েছে ফোর্ট উইলিয়ামে।

বিস্মিত হয়ে নবাব প্রশ্ন করেন ঃ আমার অপরাধ ?

তর্ক করবার সময় আমার নেই। লর্ড ক্যানিং এর হুকুম।

একটু চুপ করে থেকে নবাব বললেন ঃ বুঝেছি কি চাও তোমরা। 'হরকরা' কাগজে এর একটা আভাসও পেয়েছিলাম। চলো যাই।

নবাব ও আলী নকীকে নিয়ে এডমনষ্টোন এলেন ফোর্ট উইলিয়মে। তাদের দেয়া হলো একটি ছোট ঘর। আলো নেই, বাতাস নেই। অন্ধকারে বসে বসে দিন কাটাতে লাগলেন লক্ষ্ণৌর নবাব ওয়াজিদ আলী শা।

তেরো

মীরাটে যেদিন বিপ্লব স্থরু হলো সেদিন কানপুরে সবাই অবাক! হঠাৎ এভাবে যে গোলমাল মীরাট থেকে স্থরু হবে এ কিন্তু কেউ ভাবেনি। অতএব নানা সাহেব তার পরামর্শদাতা-দের নিয়ে বৈঠকে বসলেন। কী করে ইংরেজদের সঙ্গে লড়তে হবে। তার সঙ্গে রইলেন আজিমুল্লা ও ছেলেবেলার বন্ধু তাঁতিয়া তোপে।

ঠিক হলো খুব গোপনে কাজ করতে হবে। কাউকে কিছু জানতে দেয়া হবে না। নানা সাহেবের হাসি মুখ দেখে সাহেবেরা কিন্তু ভাবতেই পারলে না যে এই লোকটা একদিন তাদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার নেবে।

চারদিক থেকে বিপ্লবের খবর শুনে কানপুরে কোম্পানীর সাহেবরাও একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। তারা তাদের বন্ধু-দের ডেকে বললেন: সাহায্য করো। এমন কি নানা সাহেবের কাছেও সাহায্য চাইলেন। খুশী মনেই নানা সাহেব রাজী হলেন সাহায্য করতে। আর এদিকে গোপনে কোম্পানীর আয়োজন দেখে নিতে লাগলেন।

কিন্তু আগুন ছাই দিয়ে ঢাকা যায় না। চারিদিকে যখন আগুন জ্বলছে তখন কানপুরই বা চুপ করে থাকে কী করে। লড়াই স্থরু হয়ে গেলো। নানা সাহেবও ছদ্মবেশ খুলে ফেললেন।

প্রথম লড়াইতে হার হলো কোম্পানীর। সাদা পতাকা উড়িয়ে কোম্পানীর সাহেবেরা সন্ধি করে গেলেন।

কিন্তু এবার একটু ভুল হয়ে গেলো। সন্ধির সর্ত অনুযায়ী ইংরেজ ও মেমসাহেবদের গঙ্গা পার করে দেয়া হচ্ছিল। এই নদী পার হবার সময় অনেক ইংরেজ খুন হয়ে গেলেন। এই খুনের কোন খবরই নানা সাহেব জানতেন না।

কোম্পানীকে যুদ্ধে হারিয়ে নানা সাহেব গদীতে জাঁকিয়ে বসলেন। রীতিমতো দরবার স্থরু হলো। প্রজার বিচার আর দুষ্টের দমন এই হলো তার কাজ।

কিন্তু সুখের দিন বেশীক্ষণ রইল না।

নতুন করে ইংরেজ আবার আক্রমণ করলে। সেই যুদ্ধে হার হলো নানা সাহেবের। নিজের দলবল নিয়ে তিনি গঙ্গার এপারে ফতেগরে চলে এলেন। ঠিক করলেন সেইখান থেকেই ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়বেন। কিন্তু দু'দিন বাদেই টের পেলেন এ আশা নিরাশা।

তারপর একদিন গভীর রাত্রে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে নানা সাহেব রওনা হলেন নেপাল প্রান্তে !

সামনেই ঘন জঙ্গল—কিছু ভালো করে দেখা যায় না। শুধু শোনা যায় ঝিঝি পোকার ডাক। সেই আঁধারে মিলিয়ে গেলেন নানা সাহেব চিরদিনের জন্যে।

তার খবর আর কেউ কখনও শোনেনি।

চৌদ্দ

জীবন দিলেন ঝাঁসীর রাণী, কিন্তু মান দিলেন না। যেদিন ঘরে ঘরে উঠলো ডাক যে ঝাঁসীর রাণী পণ করেছেন ইংরেজদের সঙ্গে লড়বেন, সেদিন হাতিয়ার নিয়ে এলো তার ভক্ত প্রজাবৃন্দের দল।

রাণীমা, হম্ ঝাঁসী নহী দেঙ্গে।

বেশ, তবে প্রতিজ্ঞা করো প্রাণ দেবে তবু ঝাসী দেবে না।

প্রাণ দেবো ঝাঁসী দেবো না।

বীর লক্ষ্মণ রাও, মরোপত তাম্বে, ঠাকুর সর্দারের দল এগিয়ে চলেন। রাণীর জন্যে তারা প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

কিন্তু লড়াই করতে হলে সৈন্যদের গড়ে তুলতে হবে। কে করবে এই দুঃসাধ্যকর কাজ।

করলেন রাণী স্বয়ং। রাণীকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন তাঁতিয়া তোপে। ঘোড়ায় চড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন সব কাজেরই তদারক করতে লাগলেন রাণী।

তারপর একদিন যুদ্ধের ভেরী বেজে উঠলো।

· সে লড়াই হলো বেতোয়া নদী প্রান্তে। ইংরেজ প্রথমটায় আক্রমণ করলে তাঁতিয়া তোপেকে। তারপর ঝাঁসীর রাণীর সৈন্যবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

যুদ্ধে হেরে গেলেন ঝাঁসীর রাণী। গোটা শহরটাই চলে

গেলো ইংরেজের হাতে। বিশ্বস্ত সর্দারেরা এসে রাণীকে বললে ঃ রাণীমা আপনি পালিয়ে যান পেশোয়া রাজ্যে।

সর্দারদের কথা শুনে রাণী গর্জে উঠলেন। বললেন ঃ পালিয়ে যাবো! প্রাণ থাকতে নয়।

কিন্তু না পালালে চলবে না। ঝাঁসীর জন্যে লড়তে হবে। সর্দারেরা প্রায় একরকম জোর করেই রাণীকে পাঠিয়ে দিলেন। মাঝরাত্রে পুরুষের পোশাক পরে রাণী চলে গেলেন। দিনের পর রাত—রাতের পর সকাল। সমস্ত বাধা-বিপত্তি এড়িয়ে রাণী এসে কলপী শহরে পৌঁছলেন।

রাণী আসছেন, এ খবর রাও সাহেব পেশোয়া আগেই পেয়েছিলেন। তিনি সাদরে রাণীকে অভ্যর্থনা জানালেন।

তারপর আবার স্বুরু হলো লড়াই ও আয়োজন-সরঞ্জাম। কী করে ইংরেজদের হটানো যায়।

এবার যুদ্ধ হলো কাঁচগাওতে। কিন্তু একই ফল। জয় হলো ইংরেজের।

কলপী শহরে বৈঠক বসলো। কী উপায়? ভয় পাবার মেয়ে ন'ন রাণী। ঠিক হলো আবার তারা পরখ করে দেখবেন ইংরেজের শক্তি।

যমুনার প্রান্তে এই তৃতীয় যুদ্ধ হলো। জীবনকে তুচ্ছ করে লড়লেন ঝাঁসীর রাণী।

কিন্তু যার ভাগ্যে লেখা আছে পরাজয়, শত সাহস দেখিয়েও তিনি কিছুই করতে পারলেন না। এবারও তাঁকে পরাজয়ের গ্লানি মেনে নিতে হলো। ইংরেজ দখল করে নিলে কলপী।

বারবার পরাজয় সত্ত্বেও রাণী দমলেন না। নিজের বিশ্বস্ত অনুচরদের নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন গোপালপুরে। সেইখানে নেতাদের বৈঠকে ঠিক হলো নতুন করে যুদ্ধ করতে হবে। কী ভাবে আক্রমণ করা যায় ইংরেজদের—তাই চিন্তার বিষয়।

এবার এ আয়োজনে যোগ দিলেন তাঁতিয়া তোপে। আগের দুটো যুদ্ধে তিনি উপস্থিত থাকতে পারেন নি। তিনি গোপনে চলে গিয়েছিলেন গোয়ালিয়রে। সেইখানে বসে বসে লড়াইর ফন্দী আঁটছিলেন। গোয়ালিয়রে এসে তাঁতিয়া তোপে রাজ্যের সর্দারদের হাত করে ফেলেছিলেন। অতএব যেদিন তিনি রাণীকে নিয়ে সদলবলে গোয়ালিয়রে এলেন সেদিন আর কেউ তাকে বাধা দিলেন না।

শত্রু দখল করে নিয়েছে গোয়ালিয়র—কোম্পানীর সাহেবরা এ খবর পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। স্যর হিউগ রোজ সৈন্য নিয়ে এলেন গোয়ালিয়র ছিনিয়ে নিতে। তার সঙ্গে আছে একদল সিন্ধিয়ার লোক। মৎলবটা এই যে, নগরবাসীদের দেখাতে হবে ইংরেজ যার দেশ তার হাতেই তুলে দিতে চায়। বিদ্রোহীদের তাড়াতে চায়।

সৈন্য নিয়ে কোম্পানীর সাহেব আসছেন—এ খবর পেয়ে রাণীর সৈন্যমহলে সাড়া পড়ে গেলো। দিশেহারা হয়ে রাণীর অনুচরেরা এদিক-ওদিক ছুটাছুটী করতে লাগলো। কিন্তু অবিচলিত রইলেন ঝাঁসীর রাণী।

তিনি লড়াইর পোশাক পরলেন। মাথায় রইল শিরোস্ত্রাণ, গলায় মুক্তোর মালা। খাপ খুলে একবার ধারালো তরবারি দেখে নিলেন। সূর্যের আলোকে ঝক্‌মক্ করছে সেই

তরবারী। তার সঙ্গে রইল দুই বিশ্বস্ত সখী—মান্দার ও কাশী।

ঘোড়ায় চড়ে তিনি যখন যুদ্ধক্ষেত্রে এলেন তখন সৈন্যদের মধ্যে আনন্দের সাড়া পড়ে গেলো। চীৎকার উঠলো ঃ ঝাঁসীর রাণী লছমী বাই কী জয়।

অপর দিকে ইংরেজের সৈন্যবাহিনী। তাদের নেতা স্যর হিউগ রোজ।

সেদিন বীরের মতো যুদ্ধ করলেন রাণী। কোন বিপদকেই তিনি পরোয়া করেন না—মৃত্যুকে তাঁর ভয় নেই। ভাঙ্গন ধরেছে নিজের সৈন্যবাহিনীর কিন্তু তবু রাণী লড়াই করে চলেছেন।

এমনি সময় একটা গুলী এসে লাগলো মান্দারের গায়ে। মাটিতে লুটিয়ে পড়লো মান্দার। কিন্তু সেদিকে রাণীর নজর দেবার সময় নেই। রাণী হিংস্র বাঘিনীর মতো যুদ্ধ করে চলেছেন। তাঁর তীক্ষ্ণ তরবারীর আঘাতে কত গোরা সৈন্য যে প্রাণ দিলো তার ইয়ত্তা নেই। লড়াই করতে করতে হঠাৎ......।

হঠাৎ এক তরবারির চোট এসে পড়লো তাঁর মাথায়। তারপর আর এক আঘাত। ফিনকি দিয়ে বেরলো রক্ত।

সামনেই ছিল বিশ্বস্ত অনুচর রামচন্দ্র রাও দেশমুখ। আহত রাণীকে তিনি একটা কুটীরে নিয়ে গেলেন।

জীবন দীপ নিভে আসছে। রক্তে রাণীর সমস্ত দেহ হয়ে উঠেছে রাঙা। এক গ্লাস জল দিলেন গঙ্গাদাস বাওয়া। ধীরে ধীরে রাণী শেষবারের মতো সেই জলটুকু পান করে নিলেন। বীরের মতো লড়েছেন তিনি। মরতে তার কিসের ভয়। আস্তে আস্তে দেহ হয়ে এলো তার নিশ্চল। সব শেষ হয়ে গেলো।

জীবন দিলেন ঝাঁসীর রাণী কিন্তু হিন্দুস্থানের মান দিলেন না।

পনেরো

যে আগুন জ্বলে উঠেছিল দপ্ করেই সে নিভে গেলো।

দিল্লী গেলো, গেলো কানপুর, লখনউ, ঝাঁসী। দিল্লীর লড়াই যখন সঙ্গীন হয়ে উঠেছে তখন বিদ্রোহী নেতা মুহম্মদ বখৎ খাঁ এসে সম্রাটকে বললেন : এবার চলুন।

কোথায়? বিস্মিত হয়ে বৃদ্ধ সম্রাট প্রশ্ন করেন।

সম্রাট, ঐ জুম্মা মসজিদে উঠেছে কোম্পানীর ঝাণ্ডা। আর সময় নেই। ইংরেজরা যে কোনও মুহূর্তে এসে দখল করে নিতে পারে লাল কেল্লা। এ সময়টা এখানে থাকা বিপদজনক।

কী করবেন সম্রাট ভেবে পান না।

লাল কেল্লা ছেড়ে সম্রাট চলে যাচ্ছেন। সম্রাটের বন্ধু হেকিম আসানুল্লা খাঁর কানে এ কথাটা গেলো। তিনি দৌড়ে চলে এলেন কেল্লায়।

তিনিই বাধা দিলেন সম্রাটকে। বললেন : আপনি পাগল হয়েছেন। অমন কাজটিও করবেন না। ভয় নেই আপনার। আমি কোম্পানীর কাছে আপনার হয়ে 'মোক্তারনামা' পাঠিয়েছি। ইংরেজ আমাদের কোন অনিষ্টই করবে না।

হেকিমের কথা শুনে বখৎ খাঁ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। চেঁচিয়ে বললেন : বিশ্বাসঘাতক হেকিমের কথায় কান দেবেন না সম্রাট। চলুন আর দেরী নয়। আপনার জন্যে পাল্কী প্রস্তুত। দেরী করবেন না।

হেকিম গিয়ে সম্রাটের আত্মীয়দের বলেন : তোমরা বাধা দাও। যেতে দিও না সম্রাটকে। সম্রাটের বেয়াই মির্জা এলাহী বক্স বললেন : সম্রাট, ঐ বখৎ খাঁর কথা শুনবেন না। ও আপনাকে বিপদে ফেলবার চক্রান্ত করেছে। আপনি কোথাও যাবেন না।

আর দেরী নয়। বখৎ খাঁ চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। যে কোন মুহূর্তে ইংরেজ এসে কেল্লা দখল করে নিতে পারে। ঐ তো দূরে জুম্মা মসজিদ থেকে কামানের গর্জন শোনা যাচ্ছে।

কিন্তু সম্রাট গেলেন না। হতাশ হয়ে বখৎ খাঁ একাই চলে গেলেন।

সদলবলে হুমায়ুনের সমাধি মন্দিরে এসে আশ্রয় নিলেন সম্রাট।

*　　　*　　　*

সেদিনই লালকেল্লা চলে গেলো ইংরেজের হাতে।

রাত্রিবেলা দেওয়ানী-ই-খাসে বসেই ইংরেজরা ডিনার খেলেন। সারাটা দিন কেল্লায় তারা গুলী চালিয়েছেন। তাদের দেহ হয়েছে অবসন্ন—মন ক্লান্ত, হাত হয়েছে রক্তে রাঙ্গা। এবার তারা বিশ্রাম করছেন।

দূর থেকে যমুনার কলধ্বনি ভেসে আসে।

ডিনার খেতে খেতে সাহেবরা বলেন : যাই বলো না কেন দুনিয়ার স্বর্গ যদি থাকে তো এই দেওয়ানী খাসে। 'আগর ফার্দ্স বা রু জমিন অস্ত, হমিন অস্ত, হমিন অস্ত।'

তুমুল হাসির রোল ওঠে।

যে দরবারে ময়ূর সিংহাসনে বসে সম্রাট আওরঙ্গজেব প্রজাদের দমন করেছেন, সেই দরবারে বসে জেনারেল উইলসন বিদ্রোহী নেতাদের দমন করতে লাগলেন।

হঠাৎ কার যেন হদিস হয়। আরে, সবাইকে তো পাওয়া গেলো কিন্তু খাঁচার পাখিই তো উড়ে গেছে। সম্রাট বাহাদুর শা' কোথায়?

কোথায় গেছেন সম্রাট এ নিয়ে গোরা সৈন্যেরা যখন বলাবলি করছে তখন জেনারেল উইলসনের কাছে কুর্নিশ করে দাঁড়ালে ক্যাপ্টেন হডসন।

কী ব্যাপার হডসন? জেনারেল উইলসন প্রশ্ন করেন।

অনুমতি দিন বুড়ো ব্যাটাকে ধরে আনবো—হডসন জবাব দেন।

বুড়ো ব্যাটা। সে আবার কে?—বিস্মিত হয়ে উইলসন প্রশ্ন করেন।

আজ্ঞে ঐ দিল্লীর বাদশা—বাহাদুর শা। আমি খবর পেয়েছি লোকটা কোথায় লুকিয়ে আছে। শুধু আপনার অনুমতি পেলেই হলো। ধরে আনবো।

হ্যাঁ সেই ভালো। জ্যান্ত ধরে আনো, প্রাণে মেরো না হে বুড়োকে হডসন, প্রাণে মেরো না। জ্যান্ত নিয়ে এসো—বলতে বলতে উইলসনের মনটা খুশী হয়ে ওঠে।

* * *

প্রতি যুগেই বিশ্বাসঘাতক জন্মায়।

পলাশীর যুদ্ধে নিজের দেশকে বিকিয়ে দিয়েছিলেন মীরজাফর।

সিপাহী বিপ্লবের পর সম্রাটকে ধরিয়ে দিলেন মির্জা এলাহি বক্স, রজব আলী।

সম্রাটের বেয়াই এলাহি বক্স। রজব আলী সম্রাটেরই বিশ্বস্ত অনুচর।

কোথায় গেছেন সম্রাট এ খবর জানতেন এলাহী বক্স। রজব আলীও জানে সম্রাটের ঠাঁই হয়েছে কোথায়।

রজব আলী এসে একদিন হডসনকে বললে ঃ সাহেব!

হডসন বসে বসে মদ খাচ্ছিলেন। কী ব্যাপার মিঞা সাহেব। কী খবর নিয়ে এলে আজ!

সম্রাট কোথায় লুকিয়ে আছেন সে খবর পেয়েছি।

বলো কী হে—উত্তেজনায় হডসনের চোখ দুটো চক্‌-চক্‌ করে উঠলো। বলোত কোথায়—

চলুন না আমার সঙ্গে। ঐ সম্রাটের বেয়াই এলাহী বক্স, উনিও যাবেন। ভয় নেই।

রজব আলীর কথা শুনে হডসন সোজা গেলেন উইলসনের কাছে। এ খবরটা জেনারেল সাহেবকে দেয়া চাই।

জেনারেল উইলসন খুশী হয়েই হডসনকে হুকুম দিলেন সম্রাটকে ধরে আনতে। জ্যান্ত চাই এই তার আদেশ।

জেনারেলের কথা শুনে হডসন একটু নিরাশ হয়ে পড়েন।

একদল ফৌজ, রজব আলী, মির্জা এলাহী বক্সকে নিয়ে হডসন এলেন হুমায়ুনের সমাধি মন্দিরে। তার সামনেই ছিল একটা গাছের ঝোঁপ। সেইখানেই গা ঢাকা দিয়ে রইলেন

হডসন। সম্রাটের কাছে গেলেন শুধু এলাহী বক্স ও রজব আলী।

একঘণ্টা দুঘণ্টা পার হয়ে গেলো। রজব আলী এলাহী বক্স অনুরোধ জানান সম্রাটকে, আর নয়, এবার ধরা দিন। কত আস্ফালন, চোখ রাঙানি। কিছুতেই যেন সম্রাট রাজী হন না।

বিশ্বাসঘাতকেরা এবার গিয়ে অনুরোধ করে জিন্নতমহলকে।

সমস্ত কিছুই চুপ করে শুনলেন সম্রাট। নিজের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবেরা যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহ'লে তিনি কী করতে পারেন।

ধরা দিলেন।

কোথায় তোমার হডসন বাহাদুর—সম্রাট জিজ্ঞেস করলেন।

এবার ঝোঁপ থেকে বীরদর্পে বেরিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন হডসন।

সম্রাট নিজের মুকুট ও তরবারি খুলে দিলেন হডসনের হাতে।

হডসন—বাহাদুর······বলতে বলতে সম্রাটের গলা ধরে এলো।

হডসন একবার তরবারি পরখ করে দেখলো। সূর্যের আলোয় সে তরবারি উঠলো ঝক্‌মক্ করে। এই সেই তরবারি যা দিয়ে নাদির শাহ করেছিলেন দিল্লীকে শাস্ত ; এই সেই অস্ত্র যা দিয়ে পারস্য থেকে হিন্দুস্থান অবধি হয়েছিল জয়। আজ নিস্তেজ হয়ে পড়েছে সেই তরবারি।

একটা যুগ যেন শেষ হয়ে গেলো। তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে পড়লো বাবরের তৈরী রাজ্য। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পন করলেন তৈমুরের বংশধর আবুল মুজাফর সুরাজউদ্দীন মুহম্মদ বাহাদুর শা বাদশা-ই-গাজী।

*　　　　*　　　　*

তারপর স্বুরু হলো মিছিল। সে মিছিলের পুরোভাগে থাকেন হডসন সাহেব।

ঘোড়া চলে টগ-বগ টগ-বগ। পাল্কী চলে, যায় গাড়ি।

সভয়ে তাকিয়ে দেখে দূর থেকে প্রজার দল।

কী হয়েছে গো—

বন্দী হয়েছেন সম্রাট—

চুপ করে সবাই দেখে। বলবার কিছু নেই, করবার কিছু নেই। যে আশা নিয়ে শুরু করেছিল লড়াই—ভেঙ্গে গেছে সে আশা। তাই সবাই ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে দেখে আর ভাবে এই কি শেষ?

সম্রাটকে নিয়ে এলেন হডসন জেনারেল উইলসনের কাছে। জেনারেল সাহেব তো বড়ো খুশী। সম্রাটকে বন্দী করে আনা কি চাট্টিখানি কথা। তিনি তো ভেবেছিলেন হডসন বা সম্রাট কাউকেই জীবিত দেখতে পাবেন না। না, সত্যিই হডসন অসাধারণ লোক, উইলসন ভাবেন।

হডসনের পিঠ চাপড়ে উইলসন বললেন: সাবাস। হডসন শুনে খুশী।

এবার কয়েদখানায় বন্দী হলেন সম্রাট। রোজই ভাবেন কবে হবে তার বিচার। কী অপরাধে হবে তার শাস্তি। এ নিয়ে দেশের কাগজে কাগজে তখন লেখালেখি শুরু হয়ে গেছে। কবে বসবে কমিশন—কবে হবে তার সাজা—আরো কত কথা।

*　　　　*　　　　*

আরো কয়েকটা দিন কেটে গেলো। সম্রাটের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছে। রোজই সাহেব-মেমসাহেবরা তাঁকে দেখতে আসেন। একটা ঘরে তাঁকে পুরে রাখা হয়েছে। তাই মজা দেখতে আসেন সবাই। হাসি ঠাট্টা চলে। সম্রাট মুখ ফিরিয়ে নেন। আর ভাবেন......আর কতোদিন। এই প্রহসনের শেষ হবে কবে.........

*　　　　*　　　　*

"আজ বিচারের প্রহসন শেষ হয়ে গেলো। এই প্রহসনের প্রধান অভিনেতা আমি, দিল্লীর সম্রাট বাহাদুর শা। ইংরেজ উপযাচক হয়ে একদিন আমার পূর্বপুরুষের দরবারে আবেদন করেছিল এ দেশে ঠাঁই পাবার জন্যে। সে আবেদন মঞ্জুর হয়েছিল। আর আজ আমি, তাদেরই বংশধর হয়ে সুবিচারের জন্যে ইংরেজদের কাছে আবেদন জানিয়েছিলাম। কিন্তু কোন ফল হয় নি। আমার সব যুক্তিই তাদের কাছে ব্যর্থ হয়ে গেলো।

"শতাব্দী পরে আমার এই ভাগ্যের ইতিহাস কেউ পড়বে কিনা জানি না। হয়ত ইতিহাসের পাতায় আমি কলঙ্কের বোঝা নিয়ে বেঁচে থাকবো।

"কিন্তু কিসের কলঙ্ক, কিসের অপবাদ। স্বাধীনতা বজায় রাখবার জন্যে লড়াই করেছি বিদেশীর বিরুদ্ধে। এতো কলঙ্কের কথা

নয়। আমি তো বিদ্রোহ করিনি। দেশের সম্রাট হয়ে নিজের প্রজাকে যদি শাসন করে থাকি তাহ'লে কেন আমার অপবাদ হবে।

"আজ বিচারপতি ড'স সাহেব আমার বিচার করলেন। বরং বলতে পারি বিচারের নামে তিনি অভিনয় করলেন। বললেন: সম্রাট চার চারটে অভিযোগ আছে আপনার বিরুদ্ধে। এই বিদ্রোহে আপনি মুহম্মদ বখৎ খাঁকে সাহায্য করেছেন। আপনার পুত্র মির্জা মুঘলকে আপনি উত্তেজিত করেছেন। ব্রিটিশ সরকারের প্রজা হয়েও আপনি নিজেকে পরিচয় দিয়েছেন স্বাধীন বলে। শুধু তাই নয়, লালকেল্লায় সাহেবরা খুন হয়েছে। এরজন্যে দায়ী আপনি, আপনার কিছু বলবার আছে?

আমি স্পষ্ট জবাব দিলাম, না।

"বিচার শুরু হলো। আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়ে এলো আমার বন্ধু হেকিম আসানুল্লা খাঁ। আমার আত্মীয় মির্জা এলাহী বক্স কতো কথা বানিয়ে বলে এলো। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সব শুনলাম। তাদের কথার প্রতিবাদ আমি করতে পারতাম। কিন্তু করিনি। করলেও কোন ফল হতো না। কারণ বিচার শুরু হবার আগেই যে বিচারের ফলাফল ঠিক হয়ে আছে। অতএব আপত্তি জানিয়ে কী হবে।

"কিন্তু তবু একটা কথা আমায় বলতে হবে। যে কথা আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলতে পারিনি, সে কথা আমি বলে যাবো ভবিষ্যৎএর বিচারকের কাছে।

"কোম্পানীর বিচারক প্রশ্ন করেছেন যে আমি ছিলাম এ

আন্দোলনের নেতা। আমি তো নিজের ইচ্ছে থেকে নেতা হইনি। আমার দরবারে মীরাট থেকে সেপাইর দল এসে দাবি করলে, 'সম্রাট আপনি হবেন আমাদের নেতা, আমার বেগম জিন্নাতমহল এসে যখন বললে হিন্দুস্থানে স্বাধীন হয়ে বেঁচে থাকবার এই শেষ সুযোগ, আমার সন্তান মির্জা মুঘল বললে, 'সম্রাট, ঐ দেখুন প্রজার দল আপনার দিকে তাকিয়ে আছে' তখনই আমি এগিয়ে গেলাম বিপ্লবের নেতা হয়ে। এ আন্দোলনের পেছনে কোন চক্রান্ত ছিল না, জনতা নিজের থেকেই হাতিয়ার নিয়ে এগিয়ে এসেছিল।

"আন্দোলনের প্রথম দিকে আমিও একটু বিস্মিত হয়েছিলাম। কিন্তু আমার বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেল যখন দেখতে পেলাম এ আন্দোলন জনগণের আন্দোলন। আমি রাজবিদ্রোহ করেছি? যারা এ কথা বলে তারা মূর্খ। এ দেশের রাজা কে? আমি বাহাদুর শা, দিল্লীর সম্রাট, আমি। নিজের বিরুদ্ধে কী কেউ কখনও বিদ্রোহ করে। সাহেবরা বলে ঐ নানা সাহেব নাকি তাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে এ বিপ্লব করিয়েছে। এ যে কতো দূর মিথ্যে কথা সে জানেন খোদা।

"আজ বিচার সভায় দাঁড়িয়ে আমি যখন বললাম যে আমি রাজবিদ্রোহ করিনি কারণ আইনত আমিই দিল্লীর রাজা তখন সবাই হেসে উঠলেন। আমি কি ভুল বলেছি। না, কারণ বহুদিন আগে……

* * *

"......বহুদিন আগে ১৭৫৬ খৃঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আমার পূর্বপুরুষের সঙ্গে চুক্তি করেছিল। সেই চুক্তিতে তারা স্পষ্ট স্বীকার করে নিয়েছে মুঘল সাম্রাজ্যের আধিপত্য। তারপর ওয়েলেসলী সাহেব এসে আমার ঠাকুর্দা শাহ আলমের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করলেন। সেই সর্ত অনুযায়ী ঠাকুর্দার সুখ-সুবিধা দেখবার ভার তুলে দে'য়া হয়েছিল কোম্পানীকে, আর কিছুই নয়। কিন্তু তার নিজের স্বাধীনতাকে কোম্পানীর হাতে তুলে দেননি।

"কিন্তু আমাদের মনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছে কোম্পানী। নিজেদের প্রভাব বাড়িয়েছে, খর্ব করেছে আমাদের অধিকার। আমরা নির্বাক রয়েছি। কোম্পানীর প্রতি আদেশ মেনে নিয়েছি। কিন্তু আমাদের মনের দুর্বলতার এই মানে নয় যে আমরা স্বাধীনতা হারিয়েছি। সম্রাট বাবরের আমল থেকেই আমরা ছিলাম স্বাধীন—আমরা আজও স্বাধীন।

"আমাদের শক্তি যখন কমে এসেছে তখন কোম্পানী আমাদের 'নজর' দেয়া বন্ধ করলে। আমরা যে দেশের মালিক আর কোম্পানী যে আমাদেরই প্রজা, এই 'নজর' ছিল তার প্রতীক। 'নজর' দেয়া বন্ধ করে তারা দেশের কাছে প্রমাণ করল যে কোম্পানী আর আমার অধীনে নয়। বেশ, যদি তাই সত্যি হয় তারা তো শুধু মাত্র বিদেশী শক্তি; নিজের গায়ের জোরে রয়ে গেছে হিন্দুস্থানে। সেই বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে আমি যদি লড়াই করে থাকি তাহ'লে কী রাজবিদ্রোহ হলো? সত্যি আমার ভাবতে বিস্ময় লাগে কেন আমায় এই অপবাদ দে'য়া হলো আজ।

"আমার আরো একটু বলার আছে।

"একদিন বাবার সঙ্গে কোম্পানীর টাকা পয়সা নিয়ে গোলমাল হয়েছিল। আমাদের সমস্ত ক্ষমতাই কোম্পানীর হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন আমার বাবা। শুধু এক সর্তে, আমাদের মাসোহারা বাড়িয়ে দিতে হবে। বাবার এই আর্জী নিয়ে কলকাতা থেকে রাজা রামমোহন রায় কোম্পানীর বিলেতের বড়ো দপ্তরে গিয়েছিলেন। রাজা রামমোহন আমাদের হয়েই কোম্পানীর কাছে এই আবেদন করেছিলেন, টাকা বাড়িয়ে দাও তো কোম্পানীর হাতে সম্রাটের ক্ষমতা তুলে দেবো।

"সে চুক্তিপত্রে কোম্পানী সই করতে অস্বীকার করলেন। অতএব নিজেদের ক্ষমতা আর কোম্পানীর কাছে বিসর্জন দেয়া হলো না। স্বাধীন সম্রাটের সব ক্ষমতাই আমাদের অটুট রইল।

"তারপর একদিন আমি কোম্পানীর বিরুদ্ধে হাতিয়ার ধরলাম। কোম্পানী নয়, নিজের প্রজার বিরুদ্ধে হাতিয়ার নিলাম। দেশের জনসাধারণের ভালোর জন্যেই আমি লড়াই করেছিলাম। কোম্পানীকে শাসন করতে গিয়ে আমি কোন প্রতিশ্রুতির খেলাপ করিনি। বিশ্বাসঘাতকতা করিনি—এ কথা জগৎবাসী না জানুক, খোদা জানেন।"

* * *

বন্দী সম্রাট কারাগারে বসে বিচারের শেষে এই কথাই ভাবছিলেন।

* * *

সতেরো

হিংসার বাঁধ যখন ভেঙ্গে যায়, তখন মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না।

সিপাহী বিপ্লব স্থরু হবার সঙ্গে সঙ্গে এই হিংস্রতার নিদর্শন পাওয়া গেলো মীরাটে, দিল্লীতে ও কানপুরে। বহু ইংরেজ নরনারী এ বিপ্লবে প্রাণ দিলেন।

কিন্তু লড়াই যখন শেষ হলো তখন ইংরেজ এর প্রতিশোধ নিলো। সেপাইদের দেখলেই ফাঁসী দাও—এ হলো বড়ো সাহেবদের হুকুম। কয়েকদিনের মধ্যেই দিল্লী, কানপুর, লখনোউ হয়ে গেল স্তব্ধ। অমন বিশাল রাজপুরী লাল কেল্লা হয়ে উঠলো ভয়াবহ। সব হয়ে গেছে শ্মশান। শোনা যায় না শিশুর কাকলী, বন্ধ হয়েছে কবি গান। সেই নিস্তব্ধতা ভেদ করে মাঝে মাঝে শোনা যায় পুত্রহারা স্বামীহারা রমণীর ক্রন্দন।

শহরে রোজই দোকান-পাট লুট হচ্ছে। সোনা-দানা যা ছিল তা ছিনিয়ে নিচ্ছে বিজয়ী গোরা সৈন্য'র দল।

সম্রাটের বন্ধু হাজী সাহেব। নিজামুদ্দিনে থাকেন। একদিন কোম্পানীর সাহেবের দল তাকে ধরে নিয়ে এলো। তার বিরুদ্ধে মস্তো বড়ো অভিযোগ। তিনি সম্রাটের বন্ধু! ব্যস্, আর কথা নেই। মাটিতে লুটিয়ে পড়লো হাজী সাহেবের দেহ।

কোর্ট বসেছে সেপাইদের বিচার করতে।

ডাক পড়েঃ আব্দুল রহমান খাঁ, নাহার সিং, আহম্মদ আলী খাঁ—রাজবিদ্রোহের দায়ে তোমরা অভিযুক্ত। দোষী না নির্দোষ।

ঃ নির্দোষ—কাতর কণ্ঠে জবাব আসে।

ঃ তোমাদের সাজা প্রাণদণ্ড—রায় বেরুলো।

এমনি ভাবে চললো দিনের পর দিন।

* * *

ফাইলের মধ্যে হাউয়েস সাহেব লিখলেন ঃ

বন্দীরা কাল আসবে। এদের বিচারের জন্য আমি প্রস্তুত। এদের শাস্তি ফাঁসি না গুলী করে মারা। সরকারের অনুমতি চাই।

অনুমতি আসতে দেরী হলো না।

জুডিশিয়াল কমিশনার মণ্টগোমারী লিখলেন—

বহুত আচ্ছা, ফাঁসী দাও।

কমিশনার জন লরেন্স লাল কালি দিয়ে লিখলেন—

দ্যাটস্ রাইট। আমি রাজী।

* * *

কিন্তু সবাইকে মাত করলেন কুপার সাহেব।

অমৃতশহরের কাছে এক ছোট গ্রাম। সেই গ্রামের শাসন-কর্তা কুপার সাহেব। একদিন একদল পরাজিত সেপাই এসে সেই গ্রামে আশ্রয় নিলে।

খবরটা গেলো কুপার সাহেবের কানে। গ্রামবাসীদের সাহায্য নিয়ে তিনি সেপাইদের গ্রেপ্তার করলেন।

সেপাইরা বললে: আত্মসমর্পন করতে প্রস্তুত যদি বিচার পাই।

সাহেব হেসে বললেন: নিশ্চয়।

তারপর সেপাইদের পায়ে বাঁধা হলো শেকল।

সন্ধ্যা হয়ে আসে আসে। আজ বাদে কাল পবিত্র ঈদ। হঠাৎ কুপার সাহেবের মাথায় একটা ফন্দী খেলে। আচ্ছা মুসলমান আর শিখ, এদের মধ্যে তো অহি-নকুল সম্পর্ক। নিজে যে সৈন্যবাহিনী নিয়ে এসেছেন এর মধ্যে অনেকেই তো মুসলমান—কেউ বা শিখ। এদের মধ্যে ঝগড়া বাঁধালে কেমন হয়।

কুপার সাহেব শিখদের কানে-কানে কী যেন বললেন। তারপর যা হবার তাই। দু'দলে ঝগড়া বেঁধে গেলো।

এবার কুপার সাহেব তার মৎলব হাসিল করলেন। নিজের সৈন্যদের মধ্যে যাদের তিনি সন্দেহ করতেন তাদের বিদায় দিলেন।

তারপর বন্দীশালায় গিয়ে হাঁক দেন······আসানুল্লা, করিমুল্লা মুন্না সর্দার, জীবনলাল······

হাত জোর করে আসানুল্লা, করিমুল্লার দল বেরিয়ে এলো। বললে, সাহেব প্রাণ ভিক্ষা দাও।

কিন্তু তাদের আবেদন শেষ হবার আগে চললো গুলী···পটা-পট···পটাপট······

আবার ডাক পড়ে···রতনলাল, ওলাবরাম···

সেই হাত জোর করে বেরিয়ে আসা আর সেই গুলীর বৃষ্টি।

এমনি করে প্রায় ছশো সাঁয়ত্রিশ জন সেপাই যখন প্রাণ বিসর্জন দিলে তখন বাকী সেপাইরা তাদের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে অস্বীকার করলে।

সাহেব হয়ত মনে মনে হাসলেন। ছোট ঘর—এতগুলো লোক একসঙ্গে থাকলে এর ফল কী হবে তা তিনি ভালো করেই জানেন। যে ঘরে দুজনার নিঃশ্বাস ফেলবার জায়গা নেই, সেইখানে অতো সেপাই কী করে রাত কাটাবে!

কুপার সাহেব যা ভেবেছিলেন তাই হলো। পরদিন ভোরে দেখতে পাওয়া গেলো বাকী বন্দীরা দম বন্ধ হয়ে মারা গেছে।

বিচার চেয়েছিল বন্দী সেপাইরা। ভগবান তাদের বিচার করে দিলেন।

কুপার সাহেব তো খুশী। চীফ্ কমিশনার জন লরেন্স আরো খুশী। ধন্যবাদ জানিয়ে তার পাঠালেন।

অন্ধকূপ হত্যা নিয়ে ইংরেজ বহু হৈ-চৈ করেছে কিন্তু কুপার সাহেব যে ভাবে সেপাইদের বিনা বিচারে মারলেন, তার প্রতিবাদ কেউ করেন নি।

শেষ

দীপ নিভে গেলো।

শেষ হলো আমার এই রূপকথা! শুধু হয়নি বলা খুনী দরওয়াজার কথা।

হডসন সাহেব জাঁদরেল সাহেব। দেনায় জর্জরিত হয়ে যখন বিলেতে পাড়ি দেবার ফিকিরে ছিলেন তখন সাহেবদের কাছে তার গেলো ঃ লড়াইয়ের জন্য তৈরী হও। সেপাইরা বিদ্রোহ করেছে।

হডসন সাহেবের বরাত খুলো গেলো। লড়াইতে যোগ দিলেন হডসন। কিছুতেই যেন তার আশা মেটে না। তিনি ভাবছেন এমনি একটা কিছু করতে হবে যাতে বিলেতের প্রতি ঘরে ঘরে শোনা যায় হডসন…হডসন…হডসন…

কী করবেন তিনি! কুকুরের মতো তিনি বন্দী সম্রাটকে গুলী করে মারবেন। তাইতো তিনি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বড়োকর্তারা তা করতে আর দিলেন কৈ?

হডসন ভাবেন কী করা যায়।

একদিন হডসন নিজের ঘরে বসে বসে মদ খাচ্ছেন এমনি সময় রজব আলী এসে হাজির।

ঃ সাহেব—

হডসন মুখে তুলে তাকিয়ে দেখেন রজব আলী।

ঃ কী খবর মিঞা সাহেব। তোমায় অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। তোমার আর ঐ এলাহী বকসের সাহায্য না পেলে কাল সম্রাটকে বন্দী করতে পারতুম না। তারপর আর কিছু খবর পেলে ?

ঃ সাহেব, তিন শাহাজাদার খবর পেয়েছি—

ঃ কোন তিনজনা ? হডসন প্রশ্ন করে।

ঃ মির্জা মুঘল, মির্জা আবু বকর, মির্জা খাজনর সুলতান।

রজব আলীর কথা শুনে হডসন আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। বললেন ঃ বলো কী হে। চমৎকার, চমৎকার। কোথায় আছে তোমার তিন শাহাজাদা।

ঃ আপনি চিন্তা করবেন না সাহেব। সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।

একটু বাদে এলো মির্জা এলাহী বক্স।

হডসন তাকে বললেন ঃ শুনেছো মির্জা সাহেব। রজব আলী এসেছিল। বলে তিন শাহাজাদার খবর জানে—

রজব আলী ঠিকই বলেছে সাহেব। শাহাজাদারা হুমায়ুনের সমাধি মন্দিরে লুকিয়ে আছে।

তা হ'লে চলো এলাহী বক্স ওদের ধরে নিয়ে আসি। বীরদর্পে হডসন সাহেব নিজামুদ্দিনে শাহাজাদাদের ধরে আনতে গেলেন। তার সঙ্গে রইল রজব আলী ও মির্জা এলাহী বক্স।

নিজামুদ্দিনের কাছে এসে হডসন আবার গা ঢাকা দে'ন। কী জানি সেপাইদের বিশ্বেস নেই। কী করতে কী করে বসে।

হুমায়ুনের সমাধি মন্দিরে গেলো রজব আলী ও এলাহী বক্স।

কতো সাধ্য সাধনা অনুনয় বিনয়। শাহাজাদারা বলেন : ধরা দিতে রাজী আছি শুধু এক সর্তে। প্রাণে মারতে পারবেনা। সব শুনে হডসন হাসেন। আশ্বাস দিয়ে বলেন— চলোই না হে। তারপর সব দেখা যাবে।

শাহাজাদারা রাজী হলেন।

শাহাজাদাদের সঙ্গে যে সব লোকজন ছিল তাদের হাতিয়ার কেড়ে নে'য়া হলো।

তারপর লালকেল্লার পানে রওনা দিলেন হডসন ও তিন শাহাজাদা। গাড়িতে চড়ে যান তিন শাহাজাদা। তাদের পেছনে থাকে ম্যাকডোয়েল সাহেব, রজব আলী, এলাহী বক্স ও তাদের পাইক বরকন্দাজ। বেশ খানিকটা রাস্তা যাবার পর হঠাৎ হডসন চীৎকার করে বললেন শাহাজাদাদের : নেমো এসো গাড়ি থেকে।

তিন শাহাজাদা তো অবাক। হডসন সাহেব বলেন কি? এখনও তো লালকেল্লা এসে পৌঁছয় নি। সাহেব তাদের নিয়ে কী করতে চান!

কাঁপতে কাঁপতে শাহাজাদারা গাড়ি থেকে নেমে এলেন।

: দাঁড়াও সোজা হয়ে— আবার হুকুম দেন হডসন।

ব্যাপার কী?

শাহাজাদারা সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

পাশের এক সৈন্যর হাত থেকে একটা বন্দুক কেড়ে নিলেন হডসন। তারপর চললো গুলী এক-দুই-তিন।

ধূলায় লুটিয়ে পড়লো মুঘল বংশের দুলালেরা। একটা শব্দ হলোনা, আর্তনাদ হলোনা, হলোনা ক্রন্দন। পশ্চিমের সভ্যতার কাছে জীবন দিলে তৈমুরের বংশধর।

তাজা রক্তে ভিজে গেলো মাটি।

পশ্চিম গগনে সূর্য অস্ত যায়। তারই শেষ রাঙা আলো এসে পড়ে মাটির উপর। ক্ষণিকের জন্যে সে মাটি ঝিকিমিকি করে ওঠে।

অন্ধকার......অন্ধকার......অন্ধকার......অন্ধকার। এই সোনার দেশে আসে নেমে ঘন অন্ধকার।